বিদ্রোহ।

ঐতিহাসিক-উপন্যাস।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল।

মূল্য ১।০

উপহার।

দিদি,

নিষ্ঠুর-পরশে ম্লান, বোঁটা ভাঙ্গা ফুল,—
তবুও সুবাসে তার জগৎ আকুল,—
তবুও বিমল-শুভ্র স্নিগ্ধরূপ-জ্যোতি,—
জাগায় হৃদয়ে পুণ্য-তোমারি মূরতি।

বিদ্রোহী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঝড়।

পার্ব্বত্য প্রদেশ। ঝড় উঠিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর সন্ধ্যার অন্ধকারে মগ্ন। সঘোর-বাতাসে, ঘনীভূত মেঘ-রাশি পাহাড়ে পাহাড়ে ক্ষত বিক্ষত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ছুটিতেছে, দিক বিদিক-ব্যাপী বৃষ্টিধারা শত শত ক্ষুদ্র শীকর-কণায় কীর্ণ বিকীর্ণ হইয়া উড়িতেছে, পাহাড় গাত্রে তরুরাজি সজোরে হেলিয়া দুলিয়া, ছিন্নভিন্ন পত্রশাখ হইয়া নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে শৈলমালা দুর্দ্দান্ত ঝড় দেবতার চরণে সভয়ে যেন প্রণিপাত করিতেছে। সেই বৃক্ষ পল্লব-তরঙ্গায়িত পাহাড়ের আঁধার শৃঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, মেঘ প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে।

নদীতে ভীম তুফাণ, স্রোতের বেগ দুর্দ্দম্য, নৌকা যায় যায় আর থাকে না। নৌকার মধ্যে যাত্রী চারি জন, একটি

শিশু, দুই জন স্ত্রীলোক, পুরুষ এক জন। শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছুপূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আর সকলে বিবর্ণমুখে, ভয়াকুল-দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভগবানের নাম জপিতেছিল।

ঝড় বাড়িতে লাগিল, মাঝিদের কোলাহল নিশ্চিৎ-মৃত্যুর মত তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, ঘুমন্ত শিশুকে এক রমণী অন্যের ক্রোড় হইতে সহসা তুলিয়া লইয়া আপনার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল, এ বুক হইতে যেন আর মৃত্যু তাহাকে কাড়িতে পারিবে না! অন্যের মুখে তাহাতে চকিতের মত ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে এ বিরক্তি আবার পূর্ব্বের ঘন ঘোর আকুলতায় বিলীন হইয়া গেল, রমণী কাতর দৃষ্টিতে শিশুর মুখ হইতে পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দুই হাতে তাঁহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তিন জনের অস্ফুট আকুলকণ্ঠের প্রার্থনা এক সঙ্গে সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পুরুষটি রমণীর হস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, না পারিয়া সেইখান হইতেই মাঝিদের অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন। সহসা ঝটিকার প্রাণ ভেদ করিয়া হৃদয় বিদারক রব উঠিল—"গেল গেল"। মাঝিরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "গেল গেল," মেঘ বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতে রাষ্ট্র হইল "গেল গেল," দিকবিদিক হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল—

"গেল গেল।" পুরুষটি বলে রমণীর হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিলেন, রমণী অচেতন হইয়া পড়িল, অন্যজন শিশু-বক্ষে অর্দ্ধ অচেতন ভাবে উঠিয়া পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে চারিদিকে অন্ধকার, উপরে আকাশের অন্ধকার, আশে পাশে পাহাড়ের অন্ধকার, নীচে জলের অন্ধকার। এই অন্ধকারে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, তুফাণের খেলা, তাহা হইতে আরো ভয়ানক, এই অন্ধকারে অন্ধকারের খেলা,—একটা উচ্চ অন্ধকার উন্মত্ত মহিষের মত শৃঙ্গ তুলিয়া এই অন্ধকা-রের মধ্য দিয়া হন হন করিয়া নৌকার কাছে সরিয়া আসিতেছিল, এ অন্ধকার আর কিছু নহে, একটি পাহাড়-শৃঙ্গ। তাই মাঝিরা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, গেল গেল। স্রোতের টানে নৌকা তাহার উপর গিয়া পড়িতেছিল—এই পড়ে পড়ে—এই পড়িল! মাঝি দুই এক জন প্রাণভয়ে লাফাইয়া পড়িল, 'জোরে বাহ জোরে বাহ' বলিয়া পুরুষটি উন্মত্ত ভাবে নিজে একটি দাঁড় ধরিলেন—কিন্তু সে কতক্ষণ? দেখিতে দেখিতে পাহাড় ঢুঁ মারিল। নৌকা সবলে পাহাড়ের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

... ...

বিকাল বেলা, এখনো অল্প অল্প মেঘ করিয়া আছে, কিন্তু ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ আর নাই। নদী বক্ষ প্রশান্ত, আদ্র তরুলতা নিস্তব্ধ। স্তব্ধ তরুশিখরে বসিয়া কাকের দল

আর্দ্র পাখনা ঝাড়া দিয়া কা কা করিতেছে। গাছের ভিতরে ভিতরে এক একটা হনুমান লম্বা লম্বা লেজ ঝুলাইয়া গম্ভীর ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন রহস্য ধ্যানেই যেন তাহারা মহামগ্ন, কিন্তু অবশেষে নিতান্তই যখন ইহা ভেদ করিতে অক্ষম হইতেছে তখন অগত্যা উত্তর বংশের উপর ইহার আয়ত্তভাব রাখিয়া দিয়া আকাশকে আপন আপন দন্তচ্ছটা দেখাইয়া বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া বসিতেছে। এই সময় একজন পথিক নদীতীব দিয়া গমন করিতেছিলেন, সহসা নিকটে শৈলতলে শিশুবক্ষ, আহত, নির্জীব রমণীকে দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন, নিরীক্ষণ কবিয়া দেখিয়া রমণীকে এখনো জীবিত বলিয়া মনে হইল, নদী হইতে জল তুলিযা পথিক রমণীর আহত রক্তাক্ত মস্তকে, মুখে চক্ষে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, রমণী নড়িয়া উঠিল, পথিক তখন আশা পূর্ণ চিত্তে রমণীর হাতের, বন্ধন হইতে আস্তে আস্তে শিশুকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, শিশু জীবিত কি না এইবার দেখিবেন। রমণী সহসা আরো বল পূর্ব্বক শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মেলিল, তাহাব বিহ্বল বিবর্ণ দৃষ্টি পথিকের নয়নের উপর পতিত হইল, পথিক সচকিতে শিশুকে ছাড়িয়া দিলেন। রমণী তখন অস্ফুট স্বরে বলিল "দেব, ক্ষত্রিয়ানীর শিশু ক্ষত্রিয়ানী ফিরাইয়া আনিয়াছে, এই লও এখন তোমার ধন তুমি লও!"

বলিয়া দুই হাতে বক্ষ হইতে শিশুকে উঠাইয়া ধরিল। পথিক নির্জীব শিশুকে হাত পাতিয়া ধরিলেন, রমণী প্রাণ ত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্ধুতা।

গুহ্ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য সময়ে ইদরে যে ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া যান এখন অষ্টম শতাব্দীর মধ্যসময়ে তাহা মিবারের অন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; শতাব্দী কাল হইল গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্য আহর পর্য্যন্ত স্বাধিকারভুক্ত করিয়া এইখানে আশাপুর নামে রাজধানী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আহরের নাম হইতে গুহার বংশধরগণ এখন আহরিয় নামে খ্যাত। আশাপুরই এতদিন গুহলুট আহরিয়দিগের প্রধান বাসস্থান ছিল, মৃগয়া উপলক্ষে কখনো কখনো তাঁহারা ইদরে আসিয়া বাস করিতেন মাত্র। কিন্তু আশাদিত্যের পৌত্র নাগাদিত্য রাজা হইয়া অবধি ইদর আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ইদরই এখন রাজনিবাস। কিন্তু 'মিবাররাজে' আমরা যে ইদর দেখিয়া আসিয়াছি—এখনকার ইদর আর সে ইদর নহে। ইদরের মন্দিরপুর-গ্রাম এখন আর গ্রাম নাই, এখন তাহা রাজপুরী। গুহা

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজা হইয়া মন্দিরপুরের চারিদিক লইয়া রাজধানীতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন; দুর্গ, প্রাসাদ মন্দিরাদিতে ইহার এখন স্বতন্ত্র শ্রী। একলিঙ্গদেবের সেই পুরাতন কুটীর, যাহা হইতে মন্দিরপুর নামের সৃষ্টি, তাহা এখন উচ্চ স্বর্ণচূড়া-যুক্ত নূতন বেশে রাজপ্রাসাদের উদ্যান মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরপুরের সুহারমতা নদী—যাহা তীরে দণ্ডায়মানা বালিকা সত্যবতীর ভয়চকিত-দৃষ্টির সম্মুখে দুরন্ত দরিদ্র বালক গুহা ও তাহার সহচরগণের প্রচণ্ড সন্তরণে প্রতিদিন মথিত আলোড়িত হইয়া, মন্দির নিম্নের তরুলতা-তৃণ-শষ্পময় আঁকাবাঁকা পাষাণ ভূমির মধ্য দিয়া বহিয়া যাইত,* তাহা এখন মন্দির সংলগ্ন সুরম্য পাষাণ সোপানাবলী নির্ম্মিত ঘাটে সুসজ্জিত হইয়া রাজপুরুষদিগের স্নানের জন্য নিয়োজিত।

আজ মাঘের ভানু সপ্তমী, উষাকালেই মহারাজ নাগাদিত্য সহচরবর্গের সহিত এই ঘাটে সূর্য্য পূজা করিতে আসিয়াছেন। নাগাদিত্যের আর এক নাম গ্রহাদিত্য। কুগ্রহের দৃষ্টিতে নাগাদিত্যের জন্ম, জন্মের অল্প দিন পরেই নাগাদিত্য পিতৃমাতৃহীন,(মাতা, পিতার সহিত সহমরণ গমন করেন)—তাই নাগাদিত্যের কনিষ্ঠ-ভ্রাত বুধাদিত্য ইহার আর একটি নাম রাখিয়াছিলেন গ্রহাদিত্য।

---

* মিবাররাজ উপন্যাস দেখ।

যেখানে যে বিষয়ের অভাব অনুভব করা যায়, সেইখানে তাহার ভানেতেও একটি পরিতৃপ্তি। যে ধনী তাহাকে ধনী বল তাহার তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু যিনি ধনী নহেন ধনী নামে সম্ভাষিত হইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ।

নাগাদিত্যের উক্ত নামে গ্রহগণ কতদূর ভীত হইয়াছিল জানি না, তবে এই নাম রাখিয়া অবধি বুধাদিত্য অনেকটা মনের সন্তোষে ছিলেন। বিশেষ মিবারের আদিরাজ গুহার গ্রহাদিত্য নাম ছিল, তিনি বাল্যকালে কত বিপদে পড়িয়াও পরে রাজ্যেশ্বর হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। সেই নাম ধারণ করিয়ে নাগাদিত্যও যে তাঁহার ভাগ্য লাভ করিবেন বুধাদিত্য এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইতেই কি না সাধারণতঃ আশা জন্ম লাভ করে।

কেবল নামে নহে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যেও নাগাদিত্য গ্রহাদিত্যের অনুরূপ ইহা সাধারণের বিশ্বাস।

ষোড়শবর্ষীয় যুবক নাগাদিত্য উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, সুকুমার দেহ, উন্নত নাসিকা, আয়তলোচন, দৃঢ়তাপ্রকটিত-সুশ্রীমুখ।

গুহার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বোধে নাগাদিত্যও গর্ব্ব অনুভব করেন—সর্ব্বতোভাবে দ্বিতীয় গ্রহাদিত্য হওয়া নাগাদিত্যের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। নৃত্যগীত প্রভৃতি রাজকীয় আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা গুহার ন্যায় শীকার অস্ত্র খেলা প্রভৃতি লইয়াই তিনি অধিক সময় থাকেন।

অট্টালিকা উপবন-শোভিত, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ ভূষিত আশা-পুর উপত্যকা-সহর অপেক্ষা অরণ্য-পর্ব্বতশোভিত ইদরের ভীলভূমিই তাঁহার অধিক ভাল লাগে।

এখন বেলা প্রায় এক প্রহর। সূর্য্য পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, বন্দনাগান নীরব হইয়া পড়িয়াছে, শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল থামিয়া গিয়াছে। মন্দিরের রসানচৌকির ললিত রাগিণীতান এখনও কেবল মৃদু মধুর সৌরভের মত অলক্ষ্য ভাবে চারিদিক পরিপূর্ণ করিতেছে। স্নান পূজা শেষ করিয়া মহারাজ সসভাসদ ঘাটের উপরের বিচিত্র কারুকার্য্য ভূষিত মন্দির দালানে, বহু মূল্য গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছেন; অনুচর সৈন্য সামন্ত উদ্যানে, ঘাটে, সোপানে, যেখানে সেখানে সারবন্দী দণ্ডায়মান। পরশু বসন্ত পঞ্চমী গিয়াছে, রাজা হইতে সামান্য সৈনিকটির পর্য্যন্ত পরিধানে আগাগোড়া বসন্ত রং, বাতাসে শত শত দণ্ডায়মান সৈনিকের বসন্ত পাগড়ির আঁচল দুলিয়া দুলিয়া প্রভাত সূর্য্যকিরণে বসন্তের তরঙ্গ তুলিয়াছে। চারিদিকের এই নবীন বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে, বাগানের গাছে গাছে, রাজবাটী ও মন্দিরের স্তম্ভে প্রাচীরে—পরশ্বকার বসন্ত উৎসবের শুষ্ক ফুলের মালা। স্মৃতির পুরাতন ভগ্ন প্রেমের মাঝখানে নূতন প্রেমের মত চারি দিকের নবানন্দ ইহাতে ঈষৎ ম্লানাভ হইয়াও সতেজ রহিয়াছে।

রাজার পশ্চাতে সুসজ্জ প্রহরীগণ মুক্ত তরবারি হস্তে

দণ্ডায়মান, আশে পাশে সভাসদগণ এবং সম্মুখে কুশাসনোপরি আচার্য্য পাঁজি হস্তে উপবিষ্ট। ফাল্গুণ মাস আগত প্রায়, ফাল্গুণের প্রথমেই আহরিয়-উৎসব, (শীকার উৎসব,) আচার্য্য এই দিনের শীকারের একটি শুভ সময় নির্ণয় করিয়া দিবেন, সেই মুহূর্ত্তে শীকার সিদ্ধ হইলে সম্বৎসর শুভ কাটিবে. সকলে উৎসুক নেত্রে আচার্য্যের মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন। আচার্য্য পুঁথি হইতে মুখ উঠাইতে না উঠাইতে রাজা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঠাকুর—কি দেখিলেন ?—"

গণপতি ঠাকুর আপাততঃ এই মন্দিরের পুরোহিত। প্রধান পুরোহিত কয়েক বৎসর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, এখনো ফেরেন নাই। ইহাঁর বয়স অল্প—বিশ বৎসরের অধিক হইবে না, পুরোহিতের গাম্ভীর্য্য দৃঢ়তা ইহাঁতে কিছুই নাই, মাথার জটাবদ্ধ কেশ, শরীরের বিভূতি, গলার পদ্মবীজ মালা, এই তরলমতি বালকে অশোভন হইয়াছে। পৌরোহিত্যের এই মুখোষের মধ্য হইতে গণপতির মুখে চোখে হাব ভাবে একটা ক্ষুদ্র মোসাহিবি ধরণ উঁকি মারিতেছে; সভাসদগণও পুরোহিত অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অনেকটা বিদূষকের মতই ব্যবহার করেন, ঠাকুরকে লইয়া অহরহ তাঁহাদের ঠাট্টা তামাসা চলে, ঠাকুরও তাহাতে সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট নহেন, তিনিও সুযোগ পাইলে তাহাদের তামাসা তাহাদেরি ফিরাইয়া দিয়া থাকেন।

রাজার জিজ্ঞাসায় হাসিবার যে বড় কিছু ছিল তাহা নহে—তবু ঠাকুর হাসিলেন,—বলিলেন৺ "বেলা দ্বিতীয় প্রহর, দুই যাম, তিন দণ্ড, চারি পল, শুভ লগ্ন, শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ সিদ্ধি, ইহার কোন মার নাই, মুনি বচন।"

নাগাদিত্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "সে প্রায় তৃতীয় প্রহর! ভোর হইতে অতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে? সেত বিষম ব্যাপার। ইহার আগে একটা মুহূর্ত্ত নাই?"

ঠাকুর বলিলেন—"থাকিবে না কেন? প্রাতঃকাল—এক প্রহর, অর্দ্ধ যাম, তিন দণ্ড, এক পল, ছাই ধরিলে স্বর্ণ মুষ্টি হইবার সময়—"

সেনাপতি গজপতি সিংহ কহিলেন—"তবে আগেই এ মুহূর্ত্তের কথা বলিলেন না কেন?"

মন্ত্রী বলিলেন "গৃহিণীও ত ঘরে নাই, যে এতটা বেঠিক!

বিদূষক বলিল "হা হাঃ গৃহিণী থাকিলে বড় বেঠিক হইতে হইত না, ঠাকুর বিলক্ষণ ঠিক হইয়া যাইতেন।

রাজা কি ভাবিতেছিলেন সহসা কহিলেন—"বিদূষক, একটু থামহে। ঠাকুর, তবে সকাল বেলাই লগ্ন স্থির রহিল?"

বিদূষকের মুখের কথাটা মুখেই থাকিয়া গেল—ঠাকুরও একটা চোখা উত্তরের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা হইতে রেহাই পাইয়া সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"আজ্ঞে রহিল বই কি?"

মন্ত্রী স্বভাবতঃ কিছু মুখফোঁড়, তিনি বলিলেন "কিন্তু তৃতীয় প্রহরের মুহূর্ত্তটাই অধিক শুভ, তাহার কথাই ঠাকুর আগে বলিয়াছেন"—

নাগাদিত্যের বীর-শ্রীযুক্ত বালক মুখে বিরক্তি প্রকাশিত হইল—দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না প্রথম প্রহরই শীকারের সময়—"

কেহ আর কথা কহিল না। বৎসর খানেক মাত্র বুধাদিতের মৃত্যু হইয়াছে, নাগাদিত্য স্বহস্তে রাজ্যভার পাইয়াছেন। ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় তিনি এতদিন অধীনতা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। এখন সে খুল্লতাত নাই, সে বৃদ্ধ মন্ত্রীও নাই, (বুধাদিত্যের আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়)— এমন কি এই মন্দিরের পুরোহিত যিনি থাকিলে সম্ভবতঃ যাঁহার রাশ এখনো কতকটা তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইত তিনিও নাই, নাগাদিত্য এখন নিতান্ত বন্ধনমুক্ত। তিনি যে আর অধীন বালক নহেন—সভাসদগণ প্রতিপদে তাহা এখন বুঝিতে পারেন।

প্রাতঃকালই শীকারের সময় স্থির রহিল, সে সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা কহিল না, অন্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, গজপতি সিংহ কহিলেন "ঠাকুর দেখুন দেখি এবার শীকার কিরূপ মিলিবে? পুঁথিতে কি বলে?"

আচার্য্য গণনা না করিয়াই বলিলেন "শুভ মুহূর্ত্তে শীকার শুভই মেলে, এইটুক বুদ্ধি হইল না বাবা।"

বিদূষক বলিলেন—"বুদ্ধি ওঁর যত তা নামেই প্রকাশ পাইতেছে—বুদ্ধিতে উনি চার পা—" রাজার মুখ হইতে নল পড়িয়া গেল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন, সকলেই হাসিয়া অস্থির হইল। গজপতি অপ্রস্তুত হইয়া মনে মনে একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সামলাইয়া বলিলেন "ঠাকুর আপনি শুভ কাহাকে বলেন জানি না, আরবারেও শুভ বলিয়াছিলেন—তবে কিনা আরবারে একটিও বড় বরাহ মিলে নাই।"

রাজা বলিলেন—"সত্য কথা। এবার কিন্তু বড় বরাহ চাই"

ঠাকুর বলিলেন—"যে আজ্ঞা তাহাই হইবে। আপনি যখন বড় চাহেন, তখন আর কি কথা।"

গজপতি বলিলেন—"তা যদি হয় ত সে আপনার কথায় নহে, আর বারে আপনি কি বলিয়াছিলেন মনে আছে ত?"

বিদূষক বলিলেন—"ঠাকুরের সব কথাই অমনি। কিগো ঠাকুর বলেন কি? গৃহিণী ত দিন দিন গোকুলেই বাড়িতেছেন, আপনার ভরষায় আর কদ্দিন থাকি?"

কথাটায় আর কেহ হাসিল না, বিদূষক নিজেই হাসিতে আরম্ভ করিলেন, সংসারে এ এক রকম শস্তাদরের রহস্য সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

সভাসদ শ্রীমন্ত সিংহ কহিলেন—"ঠাট্টা নয়, ঠাকুরের গণনার গতিকই ঐ, ঠাকুর বলিলেন, আমার ছেলে হইবে—হইল মেয়ে"!

ঠাকুর সহজে দমিবার পাত্র নহেন, বলিলেন,

"আরে বাবা, মেয়ে কি আর ছেলে নয়? মেয়েছেলে ত বটে! অশুভ খবরটা কি হঠাৎ দেওয়া যায়, বুদ্ধিমান হইলে আপনিই বুঝিয়া লয়। আর অমন যে একটু তরতফাৎ সে গণনার দোষ নয়, কালের দোষ। গণনার নিয়ম সব কালেই এক, তবে কি না ত্রেতাযুগের আজানুলম্বিত বলিলে বুঝিতে হয় রামচন্দ্র, আর কলিযুগের আজানুলম্বিত"—বলিয়া ঠাকুর বিদূষকের দিকে হাসিয়া চাহিলেন—রাজা হাসিয়া তাহার কথাটা শেষ করিলেন, বলিলেন—

"আমাদের হনুমান।" হাসিটা বেশ ভাল করিয়া জমিল, কেবল বিদূষক একটু থমকিয়া গেলেন, তাঁহার নাম হনুমানপ্রসাদ। কি উত্তর দিবেন হঠাৎ যোগাইল না, তিনি নামের উপযুক্ত একটু মুখভঙ্গী করিলেন। যখন কথা যোগায় না তখন মুখভঙ্গীই তাঁহার অস্ত্র। এই সময় মন্ত্রী বিদূষকের মুখ রাখিলেন, আচার্য্যকে বলিলেন "ঠাকুর তবে এখন হইতে আপনি তালগাছ বলিলে আমরা আখের গাছ বুঝিব?"

পুরোহিত বলিলেন—"আমি তা বলিতেছি না—তবে কি—গতিক তাই বটে,—চাহিয়া দেখ"

একজন সৈনিক সোপানের উপর দাঁড়াইয়া পাশের একটি গাছড়া বামহাতে টানিয়া তুলিতেছিল, দুইবার টানিয়া তাহা আমূল উঠিল না, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া আসিল,

এই সময় কতকগুলা চোখ তাহার উপর পড়িল—সে শশ-ব্যস্ত হইয়া দুই হাতে তাড়াতাড়ি গাছটা টানিয়া তুলিল।

পুরোহিত বলিলেন—"শুনিয়াছি রাজা গ্রহাদিত্যের সৈনিকেরা এক একটা গাছ উপড়াইয়া তুলিতে পারিত, আর ঐ দেখ একটা তৃণ তুলিতে উহার কষ্ট!"

সেনাপতি গজপতি সিংহ বলিলেন—"আপনি যখন গাছ বলিতেছেন, তখন অবশ্য তাহা তৃণই হইবে"

ঠাকুর বলিলেন "আজ্ঞে না। এ বাড়ান কথা নহে। গ্রহাদিত্যের সৈনিকেরা যে গাছ টানিয়া তুলিত ইহা প্রসিদ্ধ কথা।"

কথাটা রাজার ভাল লাগিল না, গ্রহাদিত্যের সৈন্যেরা যাহা পারিত তাঁহার সৈন্যেরা তাহা পারে না ইহা তাঁহার পক্ষে মানের কথা নহে। গজপতি সিংহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, বলিলেন—"ঠাকুর মশায়, তৃণ না হইয়া যদি সে গাছ হয় ত বুঝি ঐরূপ গাছ হইবে?" তিনি নদী তীরের একটি গাছে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, জলের তোড়ে তোড়ে সে গাছটা এমন শিথিলশিকড় হইয়া পড়িয়াছে—যে দেখিলে মনে হয় একবার টানিতে না টানিতে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু পুরোহিত জানিতেন দেখিতে উহা যতই শিথিলমূল হউক—উহাকে উঠান বড় সহজ হইবে না। ঠাকুর বলিলেন—"আপনার সৈনিকদের ইহাই উঠাইতে আজ্ঞা হউক"।

রাজার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সেনাপতি কোন কথা কহিবার অগ্রে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন— "যে তোমাদের মধ্যে ঐ গাছটা এক টানে উঠাইতে পারিবে—সে পুরস্কৃত হইবে—"

অবাক সৈনিক বৃন্দ রাজার দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিল, রাজা আবার আজ্ঞা করিলেন, সহসা একটা কোলাহল উত্থাপিত হইল, গাছের চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—সহস্র দৃষ্টি সেই গাছটার প্রতি নিবদ্ধ হইল, অথচ কেহ সাহস করিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত নিক্ষেপ করিল না, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আগে চেষ্টা করিতে অনুনয় করিতে লাগিল—সেনাপতি কম্পিতকণ্ঠে আবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, রাজা তীব্র স্বরে বলিলেন "আমার এমন সৈনিক কেহ নাই, যে ঐ গাছটা তুলিতে সাহস করে!"—একজন অগ্রসর হইল, গাছ ধরিয়া টানিল, নিষ্ফল হইয়া লজ্জায় সরিয়া দাঁড়াইল, সেনাপতি লজ্জায় লাল হইলেন, রাজার হৃৎকম্প হইল,—আবার একজন গাছ ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিল, সেও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল, আরো দুই একজন গেল, ঐ রূপে নিষ্ফল হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল; আর কেহ যাইতে সাহস করে না, রাজা সেনাপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন "সত্যই আমার রাজ্যে এমন সৈনিক নাই, যে ঐ গাছ উঠাইতে পারে?"

সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—রাজা মাটিতে

পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"আমি উঠাইব"। দালান হইতে তিনি লাফাইয়া নামিলেন,—এমন সময়• একজন ভীল গাছটার কাছে আসিয়া বলিল "ইহা উপড়াইতে হইবে" ? বলিতে বলিতে সহস্রমুখী শিকড়শুদ্ধ. গাছটা উপড়াইয়া ফেলিল, অন্য সৈনিকেরা এতক্ষণ নিজের পরিশ্রমে তাহারি যশোদ্বার যেন উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছিল—তাহাদের হাতের টানে টানে ঐ শিথিলমূল বৃক্ষ আরো শিথিলমূল হইয়া ভীলের হস্তে উঠিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতে-ছিল।

সংসারে অনবরত এইরূপই হইতেছে। শত ক্ষুদ্রের প্রাণপণ পরিশ্রম কাহারো চক্ষে পড়ে না; তাহার স্থলে একজন ভাগ্যবানকেই সকলে দেখিতে পায়। অদৃষ্ট শত জনের ধন দিয়া আপনার এক প্রিয় ব্যক্তিকে পোষণ করে। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারো মুখে এক বার জয়ধ্বনি উঠিল না। রাজা দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; সে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। কে বলিতে পারে রাজাও তাঁহার সৈনিক-দিগের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একে আর।

এখনো রাত্র প্রভাত হয় নাই, কিন্তু দীপালোকে দুর্গ-প্রাঙ্গন দিনের ন্যায় আলোকিত। ফুল চন্দন ধূপধূনার গন্ধ-পূর্ণ, আলোকিত প্রাঙ্গন শঙ্খধ্বনিতে মাঝে মাঝে শিহ-রিত হইয়া উঠিতেছে। বাদকগণ ঢাক ঢোল স্কন্ধে শানাই বাঁশি হস্তে, সৈন্য সামন্তগণ অশ্বের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সকলেই ফুল চন্দনে ও শ্যাম বস্ত্রে সজ্জিত। আহ-রিয়-শীকারোৎসব উপলক্ষে রাজা স্বহস্তে এই শ্যামবস্ত্র সকলকে উপহার দিয়াছেন। রাজা আসিলে বাদকেরা বাজনা বাজাইয়া উঠিবে, সৈনিক সভাসদেরা অশ্বারূঢ় হইবেন। এই সময় প্রান্তরের এক নির্জ্জন প্রান্তে কয়েক জন সভাসদ চক্র করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি যেন একটা কানাকানি চলিতেছিল। জুমিয়া-ভীল মহারাজের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া অবধি দুইচার জন সভা-সদ একত্র মিলিলেই এইরূপ হইয়া থাকে।

জুমিয়া বন্য-পশুর সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে জয় লাভ করে, জুমিয়া একজন সুনিপুণ তীরন্দাজ, কুস্তিতে রাজসভায় জুমিয়াকে কেহ পারিয়া উঠে না, অল্প দিনের মধ্যেই জুমিয়ার এইরূপ নানাগুণ রাজা আবি-

স্কার করিয়া লইয়াছেন। সভাসদগণ ইহাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এতদিন যে একটা রেষারেষি ছিল, সে সকল ভুলিয়া পাঁচজন একত্র হইলেই তাহারা আজকাল একপ্রাণ হইয়া পড়ে, মুখে আর কোন কথা থাকে না, রাজার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অরাজকীয় ব্যবহারের উপর অবিশ্রাম হাস্য চলে, ভাষ্য চলে, কিন্তু যেহেতু তাহাদের পক্ষে ইহা বড় একটা হাসির কথা নহে—তাই অবশেষে তাহাদের সে সমস্ত হাসি-কানাকানি ক্রুদ্ধ তর্জ্জন গর্জ্জনে পরিণত হয়।

উহাদের মধ্যে দুই একজন বিজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা কেবল বড় একটা কথা কন না, আর সকলের তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে গম্ভীর ভাবে এমন ঘাড় নাড়িতে থাকেন আর সেই ঘাড় নাড়ার মাঝে মাঝে ধীর শান্তভাবে—বেশী নয়—কিন্তু এমন দু একটী বুলি ঝাড়েন যে অন্যের সহস্র কথার অপেক্ষা তাহার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—এবং উত্তেজিত সভাসদগণ সহস্রগুণ অধিক উত্তেজিত হইয়া রাজা ও জুমিয়ার বিরুদ্ধে খড়্গা হস্ত হইতে কৃত সঙ্কল্প হয়, ও এই সঙ্কল্প অসঙ্কোচে রাজার নিকট তখনি গিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই এই আস্ফালন আপনা হইতে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র চক্র সীমানাতেই বিলীন হইয়া পড়ে। রাজার কাছ পর্য্যন্ত তাহার একটী অণু এ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই, কেননা

সেনাপতি একদিন রাজার কাছে জুমিয়ার বিরুদ্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া রাজার চোখে আগুন দেখিয়াছিলেন।

জুমিয়া আজ এখনো এখানে আসে নাই, তাই বিদূষক গাহিতেছিলেন—

কোথায় গেলে কালরূপ
কেঁদে সারা নন্দ ভূপ,
যশোদার কোল অন্ধকার—
দাঁড়ায়ে যমুনা জলে
গোপিনী ভাসিছে জলে—
বাজে না যে কদম মূলে
রাধা রাধা বাঁশরীটি আর।

জুমিয়ার প্রতি সেনাপতি সকলের অপেক্ষা বেশী চটা, জুমিয়া তাঁহারই অধিক ক্ষতি করিয়াছে। তিনি চারিদিক চাহিয়া "তাইত" বলিয়া গোঁপ জোড়ায় ভালরূপে 'তা' দিতে লাগিলেন। তাপর বলিলেন—"আজ যদি সে আমাদের সঙ্গে শীকারে যায়—তাহ'লে কিন্তু আমি আজ আর ধনুক ধরছিনে। সে দিন যে আমার তীরটা হরিণ স্পর্শ করিল না, রাজা ত বুঝিলেন না ব্যাপারটা কি? একজন ভীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা—এ অপমানে একজন ভদ্রলোকের হাত ঠিক থাকে!"

শ্রীমন্ত বলিলেন—"রাম রাম! তোমার আমার যাতে অপমান মনে হয়—রাজা স্বচ্ছন্দে তাই করছেন।"

বিদূষক গান বন্ধ করিয়া নীরবে ভ্রূভঙ্গী করিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন, "রাজা কি আর রাজা—রাজা ত বালক।"

শ্রীমন্ত বলিলেন "দেশটা অরাজক হোল।"

মন্ত্রী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন।

সেনাপতি বলিলেন "বেশী দিন আর টিকছেনা, এই আমি বলে দিলেম। ভীলেদের অত প্রশ্রয় দেওয়া!"

মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ আশাদিত্যকে একজন ভীল ত মারতে যায়।"

সেনাপতি। "সেই পর্য্যন্তই ত ভীলেদের সঙ্গে রাজাদের মেশামেশি ছিল না—"

শ্রীমন্ত বলিলেন—"আবার যে এই আরম্ভ হোল, দেখা-যাক গড়ায় কোথায়?"

মন্ত্রী বলিলেন—"আর এরা যে সেই নির্ব্বাসিত ভীলের বংশ নয়—তাই বা কে বলতে পারে? সম্প্রতি না এসেছে?"

মুরলীধরের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল—বলিলেন—"তবে রাজার জীবনের উপর যে জুমিয়ার লক্ষ্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কই"?

কলের পুতুলের মত চারিদিকে একটা নীরব ঘাড় নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল, রাজার জীবনের জন্য সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় পুরোহিত এইখানে আসিলেন—বিদূষক বলিল—"ঠাকুর মশায় তোমারি এ কীর্ত্তি"

ঠাকুর জড়সড় হইয়া বলিলেন "কেন করিয়াছি কি?" সেনাপতি বলিলেন—"হুঁঃ করিয়াছেন কি? জুমিয়া ভীল যে রাজার এমন প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তার মূলটা কে?"

পুরোহিত নিজের জটার মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া বলিলেন "তাহাতে ত আর ক্ষতি কিছু হয় নাই।"

শ্রীমন্ত বলিলেন—"আপনার ক্ষতি নাই হোক—রাজ্যের ক্ষতি।

মন্ত্রী বলিলেন—"আপনার ক্ষতিই বা নয় কেন? আগে আপনাকে মহারাজ যত ভালবাসতেন জুমিয়া এসে পর্য্যন্ত তা কি বাসেন?"

পুরোহিত বলিলেন—"কি করিতে হইবে কি?

সেনাপতি বলিলেন-—"যা করিতে হইবে আপনি বুঝুন। আমাদের আর মান না খোয়াইতে হইলেই হইল।"

শ্রীমন্ত বলিলেন —"আপনার জন্যই এরূপ হয়েছে, আপনিই এখন বুঝিয়ে তাঁর চোখটা খুলে দিন"।

পুরোহিত কহিলেন—"রাজা কোথায়?"

শুনিলেন শিশামহলে। পুরোহিত শিশামহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশামহল—আয়নামহল—অর্থাৎ সজ্জাগৃহ। রাজা এই গৃহে শীকার সজ্জা করিতেছিলেন। সাজ একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে; বর্ম্মাবৃত দেহে অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছে, লম্বিত কেশজাল সিঁতিতে বিভক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। ভৃত্য মুকুট হস্তে দণ্ডায়মান, মুকুট

মাথায় পরিলেই সজ্জা শেষ হয়—কিন্তু রাজা তাঁহার ক্ষুদ্র স্বল্পকেশ গোঁপ লইয়া মহাব্যস্ত, তাহার আগাটায় অবিশ্রাম চাড়া দিয়া কোনমতে তাহা পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—আর মাঝে মাঝে দেয়ালের একখানি আকর্ণ বিস্তৃত বৃহৎগুম্ফ ছবির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—ছবিখানি তাহার পূর্ব্বপুরুষ গুহার। এমন সময় পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা গোঁপ হইতে হাত উঠাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"কি প্রয়োজনে" ?

ঠাকুর আশীষ করিয়া বলিলেন—"আর কিছু নহে, মহারাজের বিলম্ব দেখিয়া আগেই আশীষ করিতে আসিলাম।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন যেন বড় বরাহ পাই।"

পুরোহিত বলিলেন—"তাহাই হউক। যাইবার বিলম্ব কি ?"

রাজা বলিলেন—"বিলম্ব কিছুই নাই, এখনি যাইতেছি ?"

রাজা মুকুট পরিয়া অগ্রসর হইলেন, সহসা পুরোহিত গলার পদ্মবীজ মালার বীজগুলি সরাইতে সরাইতে বলিলেন—"মহারাজ জুমিয়া এখনো আসে নাই।"

রাজা বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন, পুরোহিত নিতান্তই সহসা ওকথা বলিয়াছিলেন; তাহার পর বলিলেন "হ্যাঁ জুমিয়ার আসিবার কথা ছিল বটে।"

পুরোহিত বলিলেন—"কিন্তু আগে নাই—তা না আসিলেই কি ভাল হয় না—" নাগাদিত্যের আবার গোঁপে হাত পড়িল—বলিলেন "ভাল হয়! কেন?"

পুরোহিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"সে ভীল আপনি রাজা—সবাই বলে—"

নাগাদিত্যের বড় বড় কাল পাতার মধ্যে কাল কাল চোখের তারাগুলা পর্য্যন্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল,

তিনি বলিলেন—"মহারাজ গ্রহাদিত্য যে ভীলের সহিত মিশিতেন সবাই কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে? তিনি যাহা পারিতেন, তাঁহার বংশধরের তাহাতে অপমান নাই। সবাই যাহা বলে বলুক—আপনিও কি তাই বলেন নাকি?"

পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—পদ্মবীজগুলি ঘন ঘন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—তিনি বলিলেন, "না তাহা বলি না,—দোষটাই বা তাতে কি,—তবে"—

রাজা বলিলেন—" 'তবে' থাক্। আপনার আজ্ঞাই আমি পালন করিব—সবাই যাহা বলে বলিতে দিন"।

রাজা দুর্গপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভাট স্তুতি-গীত গাহিল, জয়ধ্বনি বাদ্যনাদ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, রাজা অশ্বারোহণ করিলেন, সৈনিক-সভাসদেরা অশ্বারোহণ করিল—আবার কোলাহল থামিয়া গেল, সকলে রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল—রাজা একবার সভাসদ-

দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"জুমিয়া ভীলের বাড়ীর দিকে চল।"

যদি পুরোহিত রাজার চোখ ফুটাইতে না যাইতেন ত এতদূর হইত না, সভাসদগণ অবনত-মস্তকে রাজার অনুবর্ত্তী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

মন্দিরপুরের নিকটে—রাজধানীর সীমানার অব্যবহিত পারে জুমিয়ার পর্ণকুটীর। অল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য অশ্বারোহীপুরুষ জুমিয়ার কুটীর-নিকটের বিজন প্রান্তর পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্য উঠিয়াছে—তাহার তরুণ শুভ্র কিরণ সহস্র সৈনিকের শ্যাম উষ্ণীষে, শ্যাম পরিচ্ছদে, শত সহস্র উন্মুক্ত বর্ষাফলকে, সহস্র অশ্বের ঝলসিত সাজ সজ্জার উপর বিভাসিত হইয়াছে। প্রান্তরের দিকদিগন্তে স্তব্ধ তরুরাজি, সূর্য্যকিরণ-দীপ্ত শুভ্র ধূমকান্তি শৈল-শৃঙ্গরাজি, সূর্য্যের অগ্নিময় মূর্ত্তির দিকে স্তব্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, আর তাহাদেরই মত স্তব্ধনেত্রে কয়েক জন রাখাল বালক গাভী-গাত্রে হস্ত রাখিয়া—অশ্বারোহীদিগকে উন্মুখ হইয়া দেখিতেছে।

প্রান্তরে দাঁড়াইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন জুমিয়ার বাড়ী কোনটি।" একজন সৈনিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—"হুকুম হইলে খবর দিয়া আসি।"

রাজা বলিলেন "না আমি যাইতেছি"—

রাজার ইচ্ছা হঠাৎ জুমিয়াকে বিস্মিত করিবেন—এবং এইরূপে সভাসদদিগকেও ক্ষুণ্ণ করিবেন। রাজা অশ্ব হইতে নামিলেন। সভাসদগণ সকলেই রাজার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, রাজা বলিলেন "আবশ্যক নাই।" নাগাদিত্য ভীলের গৃহের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন কুটীর-সম্মুখে একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা অশ্বারোহীদিগকে দেখিতেছে। রাজাকে দেখিয়া সে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল—রাজাও সহসা সেইখানে দাঁড়াইলেন। সে বড় বড় চোখে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কে?"

রাজা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না—বলিলেন—"আমি—"

মেয়েটি বলিল—"তুমি রাজা?" রাজা বলিলেন 'হাঁ'।

বালিকা এক রাজা ও তাহার মৃগয়ার গল্প জানিত। তাহার সেই গল্পের রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া পথ হারাইয়া এক কুটীরে আসিয়াছিলেন, কুটীরে এক কন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান। তাহার মনে হইল—এ বুঝি সেই রাজা। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি

রাজা"? রাজা যখন বলিলেন 'হাঁ' তাহার কচিমুখ খানিতে হাসি ধরিল না। সে তখন আর একটু কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি বর?" রাজা হাসিলেন, সে ছুটিয়া কুটীরধারের এক তরুময় ক্ষুদ্র কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখান হইতে দুই একটি নাগকেশর ফুল কুড়াইয়া আনিয়া রাজার হাতে দিয়া বলিল "বর—তুমি ফুল নেবে?" রাজা ফুল হাতে লইলেন, বালিকার মুখটি শুভ্র আনন্দের হাসিতে প্রফুল্ল হইল, রাজা পলকহীন নেত্রে তাহার সেই হাসি ভরা কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন,—উষার শুভ্রসৌন্দর্য্য সে মুখে তিনি বিভাসিত দেখিলেন। এলোকেশের মধ্যে শুভ্র ক্ষুদ্র মুখখানি—সেই মুখে ক্ষুদ্র ভ্রূ রেখার উপরে স্বচ্ছ ললাট, নীচে চঞ্চল কৃষ্ণতারা চক্ষু, সুন্দর নাসিকা, গোলাপবর্ণ ওষ্ঠাধর—ক্ষুদ্র সুঠাম চিবুক, রঙ্গিন কাপড় পরা ক্ষুদ্র দেহ, সে মূর্ত্তিতে রাজা অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন,—নির্ম্মল উষাকালে উষাদেবী শরীরী হইয়া জগতে কল্যাণ বিতরণ করিতে আসিয়াছেন মনে হইল। রাজা কি জন্য আসিয়াছেন ভুলিয়া গেলেন,—বালিকা বলিল—"বাবাকে বলে আসি—বর এয়েছে।" বালিকা যাইতে উদ্যত হইল, রাজা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তোমার বাবা কে?"

বালিকা বলিল "আমার বাবা কে? আমার বাবা।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—'তাহার নাম কি'

"জুমিয়া ভীল"

রাজা অবাক্ হইলেন, বলিলেন—"তাকে বল রাজা আসিয়াছে।"

বালিকা দৌড়িয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, রাজা ফিরিয়া আসিয়া অশ্বারূঢ় হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুনর্মিলন।

প্রায় এক বেলার পথ হাঁটিয়া একজন পথিক মন্দিরপুর হইতে শিখরপাড়-গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

এখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর,—পরিষ্কার দিন, দূরে পাহাড় স্তরের উপর শুভ্র শ্বেত মেঘগুলি রৌদ্রদীপ্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে; নিকটে পথিকের বামদিকে পশ্চিমের একটি পাহাড়শিখরের উপর শুভ্র উজ্জ্বল আকাশ সুবিস্তৃত। তাহার একদিকে স্বর্ণ মেঘ-একখানি স্নিগ্ধ বিদ্যুতের মত পাশের ঘন ঘোর নীলাকাশের উপর জ্বল জ্বল করিতেছে, আর এক দিকে সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিষ্মাণ গোলাকার অনল মূর্ত্তি শত সহস্র অনল কিরণ-তীর নিক্ষেপ করিয়া চারিদিক সুদৃশ্য, উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ করিয়া রাখিয়াছে।

চির নবীন তৃণ গুল্মময়, শৈবাল-জড়িত তরুলতাময় পাহাড়ের হরিৎবর্ণ ঢালু গাত্র দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে; সে পথে খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পশ্চাতের অতিক্রান্ত নিম্ন-পথ গুলি দুই ধারের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া পড়ে—আর তাহার চিহ্নও থাকে না। পথের আশেপাশে বড় বড় গাছের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে প্রশস্ত তৃণ ক্ষেত্র, সেখানে গরু চরিতেছে, ঘোড়া চরিতেছে, ভীল রাখাল বালকেরা নিকটে বড় বড় লাল ফুলে ফুলে ভরা এক একটি ঝাঁকড়া পারিজাত-মন্দারের তলে কেহ শুইয়া আছে কেহ বসিয়া গান করিতেছে। চারিদিকের জঙ্গল হইতে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ আসিতেছে—তাহাদের মাথার উপর মন্দারগাছে ঘুঘু ডাকিতেছে—দোয়েল ডাকিতেছে—মাঝে মাঝে কোথা হইতে এক একবার পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া উঠিতেছে। শীতের শেষে হঠাৎ বসন্তের বাতাস বহিয়াছে তাই পাখীগুলি গীতক্লান্ত। সহসা তাহাদের সঙ্গীতের মাঝখানে কাক দু একটা বিকৃত কণ্ঠে কাকা করিয়া উঠিতেছে। তাহারা গাহিতে পারে না—তাই তাহাদের কর্কশ সমালোচনায় সুকণ্ঠদিগকে থামাইতে চাহে। পাহাড়ের উপরে গ্রাম, গ্রামের নীচেই সুবিস্তৃত ঢালু শস্য ক্ষেত্র, ভীল কৃষকেরা এখনো ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, কতক শস্য পাকিয়াছে, সেই পরিপক্ক শস্য বড় বড় কাস্তে-

হাতে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া কাটিতে কাটিতে হাসি গল্প কলহ গণ্ডগোল এক সঙ্গে বাধাইতেছে। অনেকক্ষণ হইতে ভীল বালিকাগণ শালপাতে মোড়া এক এক খানি রুটি ও দু এক টুকরা শুষ্ক মাংস হাতে করিয়া শিশুক্রোড়ে দাঁড়াইয়া আছে—কাহারো পিতা মাতা কাস্তেখানি কোমরে গুঁজিয়া কন্যার হাত হইতে শালপাতখানি হাতে লইতেছেন, কাহারো সে অবকাশটুকুও নাই, মেয়েটি লক্ষণের ফল হাতে ধরিয়া নীরব নেত্রে তাহাদের হস্ত চালিত কাস্তের দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষেত্রের এক দিকে নবকর্ষিত মৃত্তিকায় নূতন শস্যের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, নিকটের একটি হ্রদের তীরে দুই চারিজন ভীলনি—তাহাদের কোমর হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত মোটা কাপড়ের ঘাঘরা,—গায়ে আঙ্গিয়া কোর্ত্তা—গলায় এক রাশ পুঁতির মালা,—তাহারা উঁচু খোপায় পালক গুঁজিয়া, পায়ে কাঁসার বাঁকি, নাকে কাণে মোটা মোটা কাঁসা পিতলের চাকতি পরিয়া ডোঙ্গা কলে জল তুলিয়া মাঠে ফেলিতেছে। সে জল আল বাহিয়া সমস্ত অঙ্কুর সিক্ত করিতেছে।

হ্রদে কতকগুলি ভীল বালক সাঁতার দিতেছে, পাশের ডোবায় কতকজনে পোলো করিয়া মাছ ধরিতেছে, মাছ যত না ধরুক চীৎকার কোলাহল করিয়া তাহাদের ততোধিক আনন্দ হইতেছে। ক্ষেত্রের এক প্রান্তে নিবিড় অরণ্য, অরণ্য হইতে স্ত্রীলোকেরা ভারপৃষ্ঠে, পুরুষেরা বালকেরা

ধনুর্ব্বাণ স্কন্ধে, শীকার-পৃষ্ঠে ঈষৎ অবনত হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের নিকট দিয়া হঠাৎ এক একটা নীলগাই চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে পাহাড়ের খদ, খদের ধারে পোষা বরাহের দল বন্য ছাগলের সহিত একসঙ্গে চরিতেছে। একজন রাখাল বালকের একটি গরু হারাইয়াছে সে খদের ধারে গরু খুঁজিতে আসিয়া অপর পারের পাহাড় স্তরের দিকে চাহিয়া বাঁশি বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাহাড়ের অঙ্গ হইতে নির্ঝর ছুটিতেছে, তুষারশ্বেতধারায় নীচে পড়িয়া সফেন রজত কণায় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া বুঝি সে আর সব ভুলিয়া গেছে, বুঝি একটা অজানা আনন্দে তাহার হৃদয় উদাস হইয়া পড়িয়াছে, তাই কটি হইতে বাঁশের বাঁশিটি খুলিয়া সে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঠের পশ্চাতে গ্রামের একখানি কুটীর হইতে এতক্ষণ যাঁতা ঘুরাইবার শব্দ উঠিতেছিল, বাঁশি বাজিতে বাজিতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল, কুটীর দ্বার হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোকের সতৃষ্ণ নয়ন রাখাল বালকের দিকে পড়িল। সহসা বাঁশি বন্ধ হইয়া গেল, কোমরে বাঁশি গুঁজিয়া রাখাল বালক সহসা ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিল—স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহিরে আসিয়া উন্মুখ হইয়া সেই দিকে চাহিল, কাঠুরিয়া স্ত্রীলোকেরা, শীকার-পৃষ্ঠ পুরুষেরা চলিতে চলিতে স্তব্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল, কৃষকেরা কাস্তে হাতে, গম্ভীর

মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, সহসা চারিদিকে একটা গোল পড়িয়া গেল, আর কিছুই নহে, একজন. অপরিচিত পথিককে দেখিয়া তাহারা সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসা পড়িল "তুই কোনডারে ? কেন আউছুরে ? রাজাডা আসিছে নাকিরে। ইত্যাদি"—আসল কথা, এখানে কদাচিৎ নূতন লোক আসে। রাজা কিম্বা তাঁহার সভাসদগণ কালে ভদ্রে দলবল সঙ্গে এখানে মৃগয়া করিতে আসেন। এক দিনে গ্রামবাসীদের বহু পরিশ্রমের শস্যক্ষেত্র দলিত করিয়া, তাহাদের বহুদিনের আহার্য্য নষ্ট করিয়া চলিয়া যান। তাহাদের এইরূপ শুভাগমনের পূর্ব্বেই এই বিজন গ্রামে অপরিচিত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রভুদিগের আসিবার পূর্ব্বে ভীল বা রাজপুত সৈনিক ভৃত্যেরা এইখানে শিবিরাদি স্থাপন করিতে আসে, সুতরাং নূতন লোক দেখিলেই গ্রামবাসীদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নে ভীল পথিক উত্তর করিল "রাজাডার মুই ধার ধারিনে, মুই আউছি বুল্লু ভীলের কাছে, মুইডা তার কুটুম্ব"।

এই কথায় গ্রামবাসীগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, একজন সরু গলায় কুল্লু কুল্লু করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠ ভারে অবনত একজন শীকারী কু করিয়া সাড়া দিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—পথিক কথা কহিবার আগেই

অনেকে এক সঙ্গে বলিল, "আরে তোর কুটুম আসিছে, মুরা ভাবিনু রাজার লোকটা,—ভয়ে সারা হইউছিনু"।

কুল্লু কুটুম্বের প্রতি বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পথিক তাহার হাত ধরিল, বলিল "তুইডা কুল্লু"? কুল্লু ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তুইডা কোন রে?" পথিক বলিল "মুইটা তোর কুটুম—চলরে তোর ঘরকে চল।"

বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা আনন্দের ঝাঁকানি দিয়া সেই জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল, কুল্লু কথা কহিবার অবসর না পাইয়া বিস্মিত চিত্তে তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল, লোকেরা তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে যে যাহার স্থানে গমন করিল। পথিক কুল্লুর কুটুম্ব সুতরাং তাহাদের আর ইহাতে কৌতূহল বা ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু কুল্লুর কৌতূহল যেমন তেমনি রহিয়া গেল, কিছু দূর আসিয়া যখন প্রথম বিস্ময়ভার লাঘব হইল তখন বলিল" মুইডাত কুল্লু—তুইডারে ত চিনিতে নারিল?

পথিক বলিল—"আরে সেই দশ বরিষের কুল্লুডা বুড্ডা, মুইডাই চিনিতে নারিল, তুইডা কি চিনিবি! মুইডা জঙ্গু রে।"

"তুইডা জঙ্গু। আরে বার বরিষের তোর চেহারাটা মনে পড়িছে মোর! বুড্ডারে মুই চিনিবু কেমনে রে"।

দুই বুড্ডায় তখন আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে আলিঙ্গন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

কুল্লুর কুটীরের দ্বারদেশে তিনটি ছেলে মেয়ে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, দূর হইতে কুল্লুকে আসিতে দেখিয়া তাহারা হাততালি দিয়া 'দাদু দাদু' করিয়া সেই দিকে ছুটিল, কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া তাহার সঙ্গে আর একজন অপরিচিতকে দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। কুল্লু বলিল "আরে ভাইয়া সবরে, আয়রে আয়রে—আর একটা দাদু দেখিবি আয়,—এই তোদের জঙ্গুদাদা—।"

জঙ্গু দাদার গল্প তাহারা অনেক শুনিয়াছিল, এত শুনিয়াছিল যে না দেখিয়াও জঙ্গু দাদার সহিত তাহাদের বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় চেনা শুনা হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার চ'খের সম্মুখে জঙ্গু দাদার একখানি জীবন্ত ছবি অঙ্কিত হইয়া যায় নাই, এবং সে ছবির প্রতি একটা আন্তরিক ভালবাসা জন্মায় নাই। এমন কি, তাহাদের মনের এই ছবি তাহাদের নিকট এতদূর আসল হইয়া পড়িয়াছিল—যে আর কেহ আসিয়া কখনো যে ইহাকে নকল করিয়া দিতে পারে এমন সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কখনো তাহাদের মনের ত্রিসীমায় আসে নাই। সুতরাং জঙ্গু দাদার নাম শুনিয়া তাহাদের মুখ গুলি সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, অত্যন্ত অবাক হইয়া তাহারা তাহার মুখের

দিকে চাহিয়া রহিল, বিস্ময়ের প্রভাবে ছয় বৎসরের ছোট মেয়েটির ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলি সমূল মুখের মধ্যে উঠিয়া গাল দুটাকে নৌকার পালের মত ফুলাইয়া তুলিল। এমন আশ্চর্য্য যেন তাহারা জীবনে হয় নাই। তাহাদের জঙ্গু দাদা—সেত বীর মূর্ত্তি যুবাপুরুষ উগ্রভাবে ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া রাজাকে বধ করিতে উদ্যত,—এই প্রশান্ত হাস্যময় বৃদ্ধ কি করিয়া সে জঙ্গুদাদা হইবে? তাহাদের অবাক দীপ্ত-মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। বালিকা আস্তে আস্তে কুল্লুদাদার পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল—না জঙ্গুদাদা না—'

বুল্লু বলিলেন—"হাঁরে বুড়ি এই ডা জঙ্গুদাদা।"

সে কাঁদিয়া আবার ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিল, ইহার উপর জঙ্গুদাদার অস্তিত্ব রহিবার আর যেন কোন সম্ভাবনাই রহিল না। এত সহজে অস্তিত্বহীন হইয়া জঙ্গুদাদা হাসিয়া উঠিলেন, হাসিয়া বুড্ডী বুড্ডী করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া যখন বামহাতের উপর বসাই-লেন—এবং আর এক হাতে দুই বালকের এক একখানি হাত ধরিয়া আপনার চারিদিকে ঘানির বলদের মত ঘুরপাক দিতে লাগিলেন, তখন সহসা সেই বুড্ডা জঙ্গু দাদার সহিত যুবা জঙ্গুদাদার মতই তাহাদের ভাব হইয়া গেল। বালিকা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তুইডা

জঙ্গুদাদা”? বালকেরা ঘুরপাক খাইতে খাইতে জঙ্গুদাদা জঙ্গুদাদা করিয়া মহা আমোদে চীৎকার করিতে লাগিল, অবশেষে ঘুরপাক শেষ হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মহা কলরবে তাঁহাকে কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিল।

তাঁহারা 'দাওয়ায়' আসিয়া বসিলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক ক্ষেতিয়া তামাকের নল আনিতে ছুটিল, তাহার কনিষ্ঠ বুড্ডাদাদার ধনুর্ব্বাণ খুলিয়া ঘরের কোণে রাখিতে গেল, কিন্তু উঠানে নামিয়া হঠাৎ মতলবটা বদলিয়া ফেলিয়া ঘরের কোণের পরিবর্ত্তে নিজের স্কন্ধে দ্বিগুণ দীর্ঘ ধনুকের ভার চাপাইয়া, গম্ভীর মেজাজে—মস্ত লোকের চালে পা ফেলিয়া কোন রকমে ধনুকটাকে টানিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মাঝে মাঝে বক্র নয়নে কুল্লুদাদা ও জঙ্গুদাদার দিকে দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। অর্থখানা—তাঁহারা তাহার কারখানাটা দেখিতেছেন ত?

দাদার এ আস্ফালন বোনটির বড়ই অসহ্য হইল—তিনি বুড্ডাদাদার কোলে বসিয়া তাহাকে ক্রমাগত শাসাইতে লাগিলেন, ধনুক খুলিয়া না রাখিলে এখনি জঙ্গু দাদাকে একথা বলিয়া দিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দিবেন—একথা পর্য্যন্ত বলিলেন, আর সত্য সত্য কথাটা কার্য্যেও পরিণত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন কোন ফল হইল না, জঙ্গুদাদা যখন তাহাতে একটি কথাও কহিলেন না,—

তখন অগত্যা ভর্ৎসনাটা বন্ধ করিয়া জঙ্গু দাদার ঝুঁটির উপর আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে বড় ভাই তামাকু আনিয়া উপস্থিত করিল—তখন তিনি ঝুঁটি খোলা রাখিয়া বলিলেন "আমি খাবার আনিব"—বলিয়া তিনি মায়ের কাছে রান্নাঘরে ছুটিলেন। বড় ভাই বলিল—"আমিও যাইব" মেজও তাড়াতাড়ি ধনুকটা খুলিয়া তাহাদের অনু-বর্ত্তী হইলেন।

তাহারা তিন জনে চলিয়া গেল, দুই বন্ধুতে মিলিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পরে এই তাঁহাদের দেখা, তখন দুজনে ছেলেমানুষ ছিলেন, এখন প্রায় বৃদ্ধ, জঙ্গুর বয়স এখন ৫৪, কুল্লুর ৫২। এত দিন পরে আবার সেই বাল্যবন্ধু জঙ্গুর সহিত যে দেখা হইবে—কুল্লুর এরূপ আশা ছিল না, জঙ্গু যে কোথায়, বাঁচিয়া কি মরিয়া তাহা পর্য্যন্ত কুল্লু জানিতেন না।

আজিকার এই আশাতীত আনন্দে পুরাতন বিষাদ কাহিনী, পুরাতন বিদায় তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। যা ছিল তা আর নাই, যারা ছিল তারা এখন কোথায়? জঙ্গু আসিয়াছে, কিন্তু জঙ্গুর মাতা—কুল্লুর ভগিনী সে কোথায়? তাহাকে জঙ্গু নির্ব্বাসিত স্থানে চিতায় শুয়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। বিদায়ের দিনের চারিদিকের সেই ক্রন্দন কোলাহল তাহার মনে পড়িতে লাগিল, যাহারা সে দিন এক সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল তাহারা আজ

কেহই প্রায় নাই। পুরাতন স্মৃতির ভারে দুজনে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কুল্লু বলিল—

"আজ কত্ত দিনডার পর দেখা—আরে তানারা কুথা সব!"

দুজনের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল—জঙ্গু বলিল,

"যানারা গেল, তানারা যাক। তানারাত দেব হইলু, তানারাত ভালয় আছে, তানাদের লাগি দুখ নাই। বুক ফাটিলু তুইডাদের দেখি, দেশডা দেখি। যোন দিকটায় চাহুছি—আঁখিরা ঝুরিছে, পরাণ বাহুরিছে। সে দেশডা নাই, সে গ্রামডা নাই—সে মনিষ্যডা নাই। যানারা আছে তানারা কি মনিষ্যি, তানারা যেন মড়াডা! যোন পা তানাদের থেঁতো করুছে সোনডা তানারা পূজিছে। পরাণ ফাটেরে ফাটে!"

কুল্লু নীরব হইয়া রহিল, জঙ্গুর অধর প্রান্তে ঘৃণার ভ্রূকুটি প্রকটিত হইল, জঙ্গু আর অনেকক্ষণ কিছু বলিল না। কিছু পরে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—"তুইরা ভীলগাঁ হইতে উঠুলি কেনরে?"

কুল্লু বলিল, "তুরা চলু গেলি—রাজপুতরা বড় বাড়ন বাড়ুল, মুরা বড় নাকাল হইনু। রাজাডার দলে যত ভীল নায়েক (সেনানায়ক) আছিল তানাদের সব তাড়াউল। গাঁয়ে গাঁয়ে রজপুত কর্ত্তা জুটুল; মুদের তানারা কেবলি থুং ধরুল, তানাদের হাতে মুইদের খাজনা, তানাদের হাতে মুইদের মরণ বাঁচন।

রাজাডা মোদের কথা শোনে না, – তুইডা তানারে মারুতে গেলি—মুরা সবাইরে রাজা নারাজ হউল—গ্রামকে কি আর টেঁকুতে পারু?"

জঙ্গু নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কিছু পরে বলিল—"এখানে ভালয় আছুরে?"

কুল্লু। "এখন ত ভালয় আছু। মহারাজডা যত্তদিন শীকারে না আউসে। জান্নুস্‌রে ভাইডা, রাজাডা শীকারে আউলে মুদের আর পরাণ বাঁচে না। সব দলবলরে তুষ্টু করুতে মুদের গম চাল কুছু থাকে না।"

জঙ্গু। "হ্যাঃ হ্যাঃ তা জান্নুরে জানি—উপয় কি করিছু এর?"

কুল্লু। "মরিবাব লাগিন ঠিক হউছি।"

জঙ্গু। "তুইডা মুইডা যেন মরিল, মুরা বুড্ডা, মুদের ছাবালরা—তুইডার ঐ ছাবালরা—উনারা অমনি থেতোল খাইবে—পিষণ সহিবে চিরকালডা রে চিরকালডা?"

কুল্লু। "কি করিবু ভাইরা?"

ইহাদের সম্পর্ক যাহাই হউক ইহারা বয়স্য বলিয়া বাল্যকাল হইতে ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রিয় সম্বোধন।

জঙ্গু। "তুই ডা এ কথা বলুস? মোর স্বার ভাই হইল তুই, তুইডা একথা বলুস?"

কুল্লু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"মুই একাডা কি করিবু?

জঙ্গ। "একাডা হইতেই দোকাটা মেলে—দোকাটা

হইতে হাজার ডা মেলে। কাজে লাগুরে—কাজে লাগু।"
(ভাবটা চেষ্টার অসাধ্য কি ?)

কুলু। তুইডা ত কাজে লাগুলি, হইলু কি ? হউল তুই-ডার দেশছাড়ন (নির্ব্বাসন) মুইলোকদের কসা হাড়কড়ি।

জঙ্গু। আরে—কুলুয়া—মুইটা সে কালিন কি মনিষ্যি—একটা ছাবাল, ১২ বরিষের একটা শুধু ছাবাল !"

একথার অর্থ, দ্বাদশবর্ষীয় বালকের চেষ্টা একজন অদূর-দর্শীর উদ্যম মাত্র। সে উদ্যম অকৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া চিরকাল কি তাহারা চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে ?

কুলু বলিল—"কোনডা তুইরে মানা করুছে ? এত্তদিন চুপ করি আছুস কেন রে ?"

জঙ্গু। চুপ ছিনু কেন তুইডা কি জানুস নে তা ? মুইডার হাত পা বাঁধা, মুইডারে চিরণকালের লাগিন এমানি বাঁধি বাবাডা মুইটার পরাণ ভিক্ষা মাগিল ! মুইডা যে এর চেয়ে হাজার বার মরুত্তে পারুত ! মোর পরাণ থাকুল, হিচ্ছা থাকুল—মুইটা শুধু সে হত্তনভাগাদের বাণ মারুতে নারিবু—এমনি কিরেডা ! কি করুলি বাবাডা !"

তীব্র কষ্টে জঙ্গুর হৃদয় বন্ধন যেন শিথিল হইয়া আসিল।

কুলু বলিল—"তুইডা বাণ ধরুতে নারুবি ত কাজে লাগুবে কোনডা ?"

জঙ্গু। "মুইডা বাণ নাই ধরিলু, তবু কাজে লাগিবু। মুই বাণ না ধরি—মুইডার ছাবালরা ধরুবে—তুইরা ধরুবি—

ইঁদরের সব ভীলডা ধরুবে। এই মন্তর জুমিয়ার কাণে চিরণকালডা ভজুছি—এই দিনডার লাগি এত্তদিন মুই চোক চাহ্ আছি। বাবাডা যতদিন ছিল—মুই হেথা আসুতে নারিলু, এখন বাবাডা মরুল, জুমিয়া জোয়ান হউছে, এইত সময়ডা, এখন তুইরা উঠ্ দাঁড়া সব।”

কুল্লু দেখিল—জঙ্গু কৃতসঙ্কল্প, সে আবার বিদ্রোহী হইবেই হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে না বিদ্রোহী হইলেও যেন আর উপায় নাই।

সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃণ ঝড়ের মুখে না উড়িয়া থাকিতে পারে না, সবল হৃদয়, প্রখর-বুদ্ধি, দৃঢ় সঙ্কল্প, গুরু মতের নিকট দুর্ব্বল অল্প বুদ্ধিগণ মাথা তুলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইতে পারে না—সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র-কণা তাহার প্রথর তেজোরাশিতে মিলাইয়া পড়ে।

সংসার ইহা বুঝে না, সংসার অপরাধী দুর্ব্বলকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। সংসার বলে, এখানে কে সবল কে দুর্ব্বল তাহা জানি না—এখানে কে কেমন কাজ করিতেছে তাহাই জানি। যে সবল সেও নিজের ইচ্ছায় কাজ করে—যে দুর্ব্বল সেও নিজের ইচ্ছায় কাজ করে—ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কাজ করাইতে পারে না। সুতরাং নিজে যে যাহা করিয়াছে সে তাহার ফলভোগ করুক। দুর্ব্বল বলিয়া আমি তাহাকে মমতা করিব কেন?

সংসার তুই ভ্রান্ত! ইচ্ছা না করিয়াও অনেকে কাজ

করে—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেকে কাজ করিতে বাধ্য হয়! তুই হৃদয়হীন মমতাহীন কঠোর সংসার, তোর কাছে দুর্ব্বলতার ক্ষমা নাই, তুই আবার স্বর্গের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিস! ..! !

কুন্নু বলিল "এখন কি করিবু মুই?"

জঙ্গু। "এখন ভীলগ্রামকে চলু, কাছাকাছি থাকু। যতডা পারুস বসতি সেইখানকে লউ চলু"—

এই সময় কুন্নুর বিধবা পুত্রবধূ ছেলেদের গোলমালের মধ্যে একখান কাঁসার থালায় বাজরির মোটা মোটা রুটী, আর বড় বড় আস্ত লঙ্কা ফেলা লোনা শুকর মাংসের ব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গণনা।

শিখরপাড় গ্রামের অনতিদূরে পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে ঝম্নু গণৎকারের বসতি। ঝম্নুকে ভীলগণ দেবপ্রসাদিত জ্ঞান করে। সুতরাং ঝম্নুর বাক্য দেববাক্যের ন্যায় তাহাদের শিরোধার্য্য। ঝম্নুর মুখ হইতে একবার যাহা উচ্চারিত হয় তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও তাহারা অসম্ভব মনে করে না। এমন কি ঝম্নু যদি বলে এই মুহূর্ত্তে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহারা তাহার জন্য তৎ-

ক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। আকাশের চন্দ্র ভূতলে পড়িতে পারে—কিন্তু ঝন্নুর কথা ব্যর্থ হইবার নহে। ঝন্নু কোন্ অসম্ভব সম্ভব না করিয়াছেন?

একবার একজন গরু হারাইয়া ঝন্নুর কাছে গণনার জন্য গিয়াছিল—ঝন্নু একটা পতনোন্মুখ প্রস্তর মধ্যস্থিত বৃক্ষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—ঐ যে পাথরের উপর গাছ দেখিতেছ যদি পাথর খসিয়া যায় ত কি হইবে? গাছটিও পড়িয়া যাইবে। গরু হারাইয়াছে—বনের মধ্যে,—বন খুঁজিলে গরুও পাইবে।"

আশ্চর্য্য এই, চিরকাল তাহারা সেই পাথর খণ্ড দেখিয়া আসিতেছে—ঝন্নুর মুখ হইতে যেমন ঐ কথা বাহির হইল তেমনি দেখিতে দেখিতে মাস কতকের মধ্যে সম্মুখের বর্ষায় সেই পাথর খণ্ড অকস্মাৎ খসিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে গাছটা শুদ্ধ পড়িয়া গেল! গরুটা যদিও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সে খুঁজিবার দোষে। গণকের বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে, অনেক দিন পরে ঠিক সেই বনের মধ্যে একটা গরুর কঙ্গাল পাওয়া গিয়াছিল।

আর একবার একজন ভীল একটি ভীল-বালিকার বিবাহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঝন্নুর কাছে আসিয়াছিল। সে দিন প্রভাতটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল—ঝন্নু বলিল "এই মেঘ ছাড়িয়া যাইবে—আর সূর্য্য উঠিবে—তোমার অদৃষ্ট মেঘ কাটিয়া যাইবে আর তোমার ঐ বালিকার সহিত বিবাহ হইবে।"

সত্যই কি—সেই দিন দুই প্রহরে যেমন মেঘ কাটিয়া গেল—অমনি সূর্য্য প্রকাশ হইল! কেবল তাহাই নহে পরে বালিকার সহিত তাহার বিবাহও হইয়াছিল। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি আছে?

এইরূপে ঝন্নু যাহা বলিত কোন না কোন প্রকারে তাহা সফল হইয়া যাইত, ভীলগণের আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকিত না।

আজ প্রাতঃকালে দুইজন ভীল তাহার নিকট গণাইতে আসিয়াছে। ঝন্নু তাহাদের লইয়া তাহার কুটীর সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। তাহার মাথায় লতাপাতা জড়ান, তাহার গাত্রের মলিন-অঙ্গাবরণের উপরে এক রাশ পুঁতির ও ফুলের মালা ঝুলিতেছে, সে হাতে এক মন্ত্রযষ্ঠি লইয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে তদ্দ্বারা মাঝে মাঝে ভূমিতে আঘাত করিতেছে। সাতবার এইরূপ আঘাতের পর ঝন্নু বলিল—জিনিসডা—জিনিসডা,—কোন জিনিসডা? ঘটি, বাটী, কাস্তে, উঁহুঁ—হাত দে—”

“তাহারা দুইজন যষ্ঠি স্পর্শ করিল, তখন ঝুন্নু আবার মাটীতে যষ্ঠি আঘাত করিয়া নানা জিনিসের নাম করিতে লাগিল—কিন্তু ইহার মধ্যে বরাবর তাহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে সে ভুলিল না। ক্রমে জিনিসের নাম ফুরাইলে পশুর নাম আরম্ভ করিল, বলিল—“গরুডা? ঘোড়াডা?

ছাগলডা? মহিষডা? ভেড়াডা? শুকরডা? গাধাডা? উঁহুঁ মানুষডা”—

ভীলদিগের মুখ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঝন্নু বলিল—“মানুষ, কোন মানুষ? ছেলে মানুষ—না, মেয়ে মানুষ—না, যুবা মানুষ—হ্যাঁ। সে কোন্‌ডা? সে কোন্‌ডা? চোরডা?”

জঙ্গু আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল,—“চোর? না চোর না, ডাকাত না, ডাকাতের বাড়াডা—

কুল্লু বলিল—“চুপ্ কর, গুণিতে দিউরে”।

ঝন্নু বলিল—“চোর? না। ডাকাত? না। শত্রু”—

জঙ্গু বলিল—“ঠিক বল্লুরে—শত্রু,”

গণক। “শত্রু শত্রু। তানাডার মন্দের লাগিন আসুছিস।”

জঙ্গু বলিল—“তানারে মারিবার লাগিন আসুছি—মরুবে কি?”

গণক গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—“হুঁ মারিবার লাগিন আসিছু, মরুবে কি? দেবকে তুষ্ট, কর, উত্তর মিলুবে!”

জঙ্গু বলিল “একডা ছাগ দিবু, দুইডা শূকর দিবু”

ঝন্নু বলিল “মুই তবে সুধই আসি।”

প্রবাদ এই—শাল গাছ জঙ্গুর পিতৃ পুরুষের আত্মাদিগের

প্রিয় অধিষ্ঠান স্থান, সুতরাং ঝন্নুর কুটীরের পশ্চাতে পাহাড়ের কিছু নিম্নাংশে এক বাঁধান পুরাতন শালগাছের নিকট গিয়া ঝন্নু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এক ছাগল দুই শূকর—এক ছাগল দুই শূকর"। বার কতক এইরূপে চীৎকার করিয়া আবার সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, শালদেবের উত্তর শুনিবার জন্য ভীলগণ উৎসুক হইয়াছিল, ঝুন্নু বলিল "উঁহুঁ তাহাতে হইবে না, আর একটা গরু চাই।"

জঙ্গু বলিল "তাই দিবু। আর সিদ্ধ হউলে সোণায় গাছ মড়াইবু"।

ইহা শুনিয়া ঝুন্নু আবার বৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহাকে সেই কথা নিবেদন করিল। বলা হইলে মাটী হইতে একগাছি কুটা উঠাইয়া লইয়া বৃক্ষের গাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল, কিন্তু তাহার ফুঁয়ে কুটা গাছটি শাল বৃক্ষের গাত্র পর্য্যন্ত না আসিয়া নীচে মাটিতে পড়িল, ঝুন্নু কুটা উঠাইয়া আবার তাহাতে ফুঁ দিলে দ্বিতীয়বারে তাহা তাহার গাত্রে আসিয়া পড়িল। ঝুন্নু মনে মনে বলিল "প্রথমে ভূমে পড়িল তাহার অর্থ—সিদ্ধ হইবে না, দ্বিতীয় অর্থ, সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ইহার কোনটি ঠিক ?" আর একবার সে কুটাতে ফুঁ দিল, কুটা গাছের কাছাকাছি আসিয়া নীচে পড়িল—কিন্তু একেবারে গাছ স্পর্শ করিল না। ঝুন্নুর একটু গোল বাধিল। কিন্তু তিন বারের পর আর এরূপ করিতে নাই—সে ফিরিয়া আসিয়া

বলিল—"চেষ্টা কর সিদ্ধ হইবে—সিদ্ধ না হইলে হতাশ হইও না"—

জঙ্গু বুঝিল, শালদেব প্রসন্ন, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহারা দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঝুমুকে প্রণাম করিল, তাহার পর শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল, শাল প্রণাম করিতে করিতে জঙ্গু মনে মনে বলিল—"দেবতারা তুষ্টু হও, তুইদের ছাবালেরা তুইদের কাজেই হাত দিউছে, কাজ হউলে তুইকেই আগে সোণায় মড়াইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ঘটনা।

লোকে অনেক সময় নিতান্ত কেবল একটা গায়ের জ্বালায় একজনের সম্বন্ধে এমনতর সব বাজে কথা বলিয়া বসে, যাহার মূল কেবল বক্তার মনের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া মেলে না। বক্তার ইচ্ছা—'এইরূপ হউক'—এই ইচ্ছা হইতেই আগা গোড়া কথাগুলার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এমন কি, স্রষ্টা যিনি তিনি যদিও কথা-গুলা বলিবার সময় খাঁটি সত্যের মত করিয়াই বলেন, কিন্তু তিনিও ঠিক তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া বলেন না। তথাপি পরে কখনো কখনো তাহাও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর কি—বক্তার ভবিষ্যৎ-

দৃষ্টির ক্ষমতার প্রতি তাহার বন্ধু বান্ধব পারিষদদিগের ভক্তির সীমা থাকে না—আর সর্ব্বাপেক্ষা বক্তাই নিজে, নিজের এই দূরদর্শীতায় অবাক হইয়া যান। এই একটি ঘটনা হইতে নিজের অদ্বিতীয় অনুমান শক্তির উপর তাঁহার এতদূর অকাট্য বিশ্বাস জন্মে যে ভবিষ্যতে আর দশসহস্র অনুমান মিথ্যা হইলেও সে বিশ্বাস তাঁহার টলে না। টলিবে কি, তখন বক্তার মুখ নিঃসৃত বাক্য আর ত অনুমান নহে, তাহা এক একটি সিদ্ধান্ত সত্য।

সভাসদগণ যদি জানিতেন, কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া জুমিয়া সম্বন্ধে সে দিন তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাকে উক্তরূপ ভবিষ্যৎ বক্তার পদে যে অধিষ্ঠিত করিয়া ফেলিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় -সভাসদগণ এখনো তাহা জানিতে পারেন নাই। জুমিয়া যে সত্যই নির্ব্বাসিত রাজদ্রোহী জঙ্গুর আত্মীয় ব্যক্তি, এমন তেমন আত্মীয় নহে, তাহার আপনার পুত্র, আর জঙ্গুর এখানে আগমনের অভিপ্রায়ও যে রাজার পক্ষে কিরূপ হানিজনক তাহা পাঠক জানিয়াছেন—কিন্তু সভাসদগণ তাহা না জানায় তাঁহারা একটি বিশেষ আনন্দ বিশেষ সুবিধা হারাইয়াছেন।

এইখানে আমরা জঙ্গুর আর একটু পরিচয় দিয়া লই।

জঙ্গু ভীলরাজ মন্দালিকের বংশ। জঙ্গুর পিতামহ চিন্তন মন্দালিকের প্রপৌত্র। গুহার বংশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তাহাদের ন্যায্য সিংহাসন হইতে যে গুহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ইহা তিনি কোন মতেই ভুলিতে পারেন নাই।

জঙ্গুর পিতা, চিন্তনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত। পুত্র জন্মিবার অল্প দিন পরেই এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়, চিন্তন আবার বিবাহ করেন এবং পুত্র মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়। জঙ্গুর পিতামহীর পিত্রালয় ভীলগ্রাম হইতে একে অনেক দূরে, তাহার পর চিন্তন দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া ব্যস্ত থাকায় জঙ্গুর পিতার খোঁজ খবর লওয়া তাঁহার বড় ঘটিয়া উঠিত না। পুত্রের বয়স যখন পঞ্চদশ তখন হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন সে আশাদিত্যের একজন সেনা হইয়াছে। অপমানে কষ্টে তিনি জ্বলিয়া উঠিয়া আশাপুর গমন করিয়া পুত্রকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিলেন পুত্রের মনের এতদিনের সঞ্চিত দৃঢ়বদ্ধ রাজানুরাগ উৎপাটন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। গুহার কৃতঘ্নতা কহিয়া পুত্রের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রজ্জ্বলিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্র বলিল "রাজা আমাকে পুত্রের মত ভালবাসেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে পারি না।"

পুত্রের কথায়, তাহার রাজানুরাগে পিতার ক্রোধ সহস্র গুণে বাড়িল। শৈশবাবধি পুত্রকে দূরে রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি? তাহার পুত্রাদি যাহাতে পিতার ভাব না পায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ভীলগ্রাম হইতে নিজের মনের মত একটি কন্যা বাছিয়া পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন, এবং জঙ্গু পাঁচ বৎসরের হইতে না হইতে পুত্রবধূকে ও তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া সেই বয়স হইতে তাহাকে রাজবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গুহার কৃতঘ্নতা, মণ্ডলিকের রক্তাক্তদেহ প্রতিদিন সে সম্মুখে দেখিতে লাগিল। এই অবস্থায় জঙ্গুর দ্বাদশ বৎসর বয়সে মহারাজ আশাদিত্য সসৈন্যে ইদর আগমন করিলেন, পুত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া জঙ্গুর পিতা তাহাকে রাজ সেনানী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতার এই প্রস্তাবে জঙ্গু রাজার প্রতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল। তাহার পিতাকেও ভৃত্য করিয়া ক্ষান্ত নহেন, আবার তাহাকে পর্য্যন্ত ভৃত্য করিতে চাহেন! এই সময় আবার একটি ঘটনা হইল, জঙ্গুর এক আত্মীয়কন্যা একজন ক্ষত্রিয়সেনার গৃহে চলিয়া গেল। তাহাদের মনে ছিল—ক্ষত্রিয়সেনা তাহাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু সে বিবাহ করিল না, তাহার গৃহে সে দাসীরূপে রহিল। জঙ্গুর ক্রোধের সীমা রহিল না। মৃগয়া

ক্ষেত্রে স্বয়ং মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সে ইহার বিচার প্রার্থনা করিল। মহারাজ বলিলেন "ইহা বিচারের স্থল নহে, বিচারালয়ে বাদী অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি বিচার করিবেন।" জঙ্গুর উত্তপ্ত কৈশোর রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, অদূরদর্শী বালক হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া সেইখানে তাঁহার প্রতি বর্ষা নিক্ষেপ করিল, কিন্তু দৈব ক্রমে রাজা বাঁচিয়া গেলেন—জঙ্গুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

জঙ্গুর পিতা আশাদিত্যের একজন প্রিয় সেনা ছিলেন। তিনি কাতর চিত্তে পুত্রের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন—শপথ করিয়া বলিলেন, এবার মার্জ্জনা পাইলে সে আর কখনো রাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবে না। পিতার কাতর-প্রার্থনায় মহারাজ পুত্রকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন। জঙ্গুর পিতা পিতামহ সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন।

৪০ বৎসর পরে পিতার মৃত্যুর পর জঙ্গু আবার দেশে ফিরিয়াছেন, পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তিনি পিতার জন্য বিদ্রোহী হইতে পারেন নাই, এই ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে আগুণ হৃদয়ে জ্বলিয়াছিল এখনো তাহা নিভে নাই, যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন এখনো তাহা ছাড়েন নাই, সেই আগুণে আহুতি দিতে, সেই ব্রত উদযাপন করিতেই এতদিন পরে আবার তাঁহার দেশে প্রত্যা-

গমন। চিরদিনের সেই আশা এখন তাঁহার পূরিবে কি?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জঙ্গু শিখরপাড় হইতে মন্দিপুর অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। প্রাতঃকাল; শ্যামসৌন্দর্য্যময় শষ্য ক্ষেত্রে, বসন্তপক্ষীর স্বরলহরী-তরঙ্গিত-নবপল্লবিত বনানী শিখরে, নীলাভ পাহাড় স্তর-আলিঙ্গিত সুন্দর সুনাল মেঘে, চৌদিকের দূর দূরান্তব্যাপী অনন্ত দৃশ্যে সূর্য্যের প্রাতঃকিরণ-বিভাসিতমধুর আনন্দ বিরাজমান। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় জগতের দিকে চাহিয়া—জঙ্গু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পীড়িত হৃদয়ে কেবলি ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন—কেবলি মনে হইতে লাগিল, "এই শোভা সৌন্দর্য্য-বিকশিত বন প্রদেশ একদিন তাঁহাদের ছিল—আবার কি তাঁহাদের হইবে না? এই প্রভাত সূর্য্য—এই মধুর বসন্ত এক দিন তাঁহাদের আনন্দ দিবার জন্যই বিকশিত হইত, এই অধীন জাতির সুখের জন্য এখন আর তাহারা উদয় হয় না, কিন্তু কখনো কি আর দিন ফিরিবে না? হায় হায়! তাঁহাদের সব ছিল রে সব ছিল, সে দিনও সব ছিল। সে দিন মাত্র—সে দিনও, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মন্দালিক এই পশুপক্ষী-বন-অরণ্যশালী শৈল প্রদেশের রাজা ছিলেন, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক গুহাকে ভালবাসিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলেন। পিতামহের প্রতি কথা, প্রতি উত্তেজনা জঙ্গুর যতই মনে পড়িতে লাগিল সমস্ত ব্যাপার ততই সে-

দিনের বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। মন্দালিকের মৃত দেহ পর্য্যন্ত যেন জঙ্গু চোখের উপর দেখিতে লাগিলেন।*

ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুত চরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার সময় যে পথে আসিয়াছিলেন অন্য মনে সে পথ ছাড়িয়া যে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিতেও পারিলেন না। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত গ্রামের মাঠে আসিয়া তাঁহার যেন সব নূতন মনে হইতে লাগিল। এগ্রাম এমাঠ যেন তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই। একটু ভাবিয়া মনে পড়িল এ সমস্তই আগে বন ছিল। দেখিলেন মাঠে ভীলেরা চাষ করিতেছে। সাধারণ ভীল হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র বেশ। তাহাদের অঙ্গে ধনুর্ব্বাণ কিম্বা কটিদেশে কোন প্রকার খড়্গ আবদ্ধ নাই। কর্ণে রৌপ্যবলয়, পরিধেয় অবিকল ক্ষত্রিয় পরিচ্ছদ, মাথায় ক্ষত্র উষ্ণীষ, দেহ অপেক্ষাকৃত সুকুমার। জঙ্গু তাহাদের পরিধান পরিচ্ছদ, চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। জঙ্গুর সময়ে ক্ষত্রিয় সংসর্গে ভীলদের যে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই—এমন নহে। দেড় শত বৎসরেরও অধিক হইল—ক্ষত্রিয়গণ ইদর অধিকার করিয়াছেন—জঙ্গু নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ৪০ বৎসর মাত্র। অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে ভীলদিগের—বিশেষতঃ রাজভৃত্য ভীলদিগের—

* মিবাররাজ উপন্যাস দেখ।

নিতান্ত সামান্য কৌপীন পরিধান এবং শীতকালে এক-মাত্র পশুচর্ম্ম ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে, শীকারমাংসই তাহাদিগের একমাত্র খাদ্য না হইয়া চাষবাস কতক কতক আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু একেবারে এতটা পরিবর্ত্তন জঙ্গু দেখিয়া যান নাই, তাঁহার চক্ষে ইহা আজ নিতান্তই নূতন – নিতান্তই বিস্ময়জনক। তিনি নিকটে আসিয়া এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেথাকা'র বন কি হইলুরে ?"

একজন ক্ষেতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"অবে তুইডা কোন জঙ্গল থেকে আওলুরে ?"

আর একজন বলিল—"সে রাজাডা কাটি লইছে।"

জঙ্গু। "কত্তদিনডা ?"

উত্তর। বছর ৩০ হইলু।"

জঙ্গু। "ক্ষেতডায় কত্ত শষ্য হউছে ?

উত্তর। "তা ঢের।"

জঙ্গু। "তুইদের কয়জনডার ক্ষেত ?

উত্তর। "জনটার না।"

জঙ্গু বিস্মিত হইলেন—বলিলেন "জনটার না—তবে কোনডার ?"

উত্তর। "জায়গীরদারের।"

জঙ্গু। "তুইরা কে তানাডার ?"

উত্তর। "মুরা শুধু দাস।"

ভীলেরা দাস! এই কয়েক বৎসরে এতদূর হইয়াছে!

জঙ্গু হৃদয়ে বিষম আঘাত অনুভব করিলেন, বলিলেন,—"দাস কোনডা করিল" ?

উত্তর। দশ বরিষের কথাডা। উপরি উপরি দুই বছর আকাল পড়িল, মুরা না খাইয়া মরিবার নাকাল হইনু, জায়গীরদার বলিল 'তুইরা দাসখৎ লিখি দে তুইদের খাওয়াইবু।' মুইরা তাহ করিলু।"

ঘৃণায়, ক্রোধে জঙ্গুর ওষ্ঠাধর ভ্রুকুটি বদ্ধ হইল—তিনি বলিলেন—"ধিক তুইদের পেট্‌কে! ইদরের জঙ্গলডা থাকুতে খাইবার লাগিন দাস হইলু তুইরা! জানোয়ারে তুইদের পেট ভরিলু না ?"

উত্তর। "আরে ভাই, মুইরা কি ধনুক ধরিতে জানু ? ৪০ বারষ আগে মুদের বাবারা—রাজাডার সেনা ছিল—কইবু কি—চাঁদিলা বলি একটাজন রাজাডারে মারুতে গেইল, রাজা রাগ করি বাবাদের বাণ কাড়ু বলুল—যা তুইরা চাষ করি খা। মুদের বাবারা চাঁদিলার কুটুম হউত—তাই রাজাডা রাগ করুল। তাই মোরা ২০ ঘর ধনুক ধরুতে জানু না। নইলে মুইদের এই দশা। সর্ব্বনেশে চাঁদিলা!"

জঙ্গুর আসল নাম চাঁদিলা। জঙ্গু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠন সুশ্রী ছিলেন, তাই পিতামহ তাহার নাম চাঁদিলা রাখিয়াছিলেন। অসভ্য আদিম জাতি বলিয়া পাঠক যেন ভীল জাতিকে কাফ্রির দলে না ফেলেন। ভীলেরা দেখিতে

সাধারণতঃ শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, সুশ্রী মুখ। সাধারণ বাঙ্গালীর সহিত সাঁওতালদিগের চেহারার যেমন সাদৃশ্য,—সাধারণ হিন্দুস্থানীর সহিত ভীলদিগের চেহারারও সেইরূপ সাদৃশ্য।

চাঁদিলা নামেই জঙ্গুকে বাহিরের সকলে জানিত। কিন্তু ঘরের লোকে কেহ কেহ তাহাকে আদর করিয়া জঙ্গু জঙ্গু করিতেন,—সেই জন্য বুল্লুও তাহাকে জঙ্গু বলিয়া ডাকিত।

জঙ্গুর ঘৃণা মমতায় পরিণত হইল। একটী হৃদয়ভেদী কষ্টে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার পূর্ব্ব পুরুষ মন্দালিক ক্ষত্রিয়কে রাজ্য দিয়া দেশের সুখশান্তি যে জলাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন সেই অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়া তিনিই এখনো দণ্ডায়মান! দেশের এই অধীনতা এই হীনতার তিনিই যেন এখনো মূর্ত্তিমান কারণ! প্রতিশোধের স্পৃহা তাঁহার দ্বিগুণ হইয়া উঠিল—সেই সঙ্গে প্রকৃত স্বাধীনতার মহানভাবে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল,।

এক এক এমন মুহূর্ত্ত আছে যে মুহূর্ত্তে অচেতনকে চেতনা দেয়—অন্ধকারকে আলোক প্রদান করে, পাপকে পুণ্যে পরিণত করে। এই মুহূর্ত্তে জঙ্গুর হৃদয়ের প্রতিশোধস্পৃহা অজ্ঞাতভাবে স্বজাতির অনুরাগে এক হইয়া পড়িল।

এই সময় একজন ভীলগ্রামবাসী পরিচিত ভীল এইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হউছে রে?" সে

কথা জঙ্গু শুনিলেন না, জঙ্গু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"ভীল এখন ক্ষত্রিয়ের দাস!" আগন্তুক তাঁহার রাগ দেখিয়া হাসিল, বলিল—"তুইডার তাতে কি? জুমিয়াকে যে রাজা বড় ভালবাস্থল"। জঙ্গু বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন। সে তখন জঙ্গুর এ কয়দিনকার অনুপস্থিতিকালে জুমিয়া রাজার কিরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহা গল্প করিল। জঙ্গু আর দাড়াইলেন না, বিদ্যুৎবেগে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জঙ্গু যখন বাড়ী পৌঁছিলেন—তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। তিনি গৃহে পা দিতে না দিতে আবার সেই কথা! বধূরা তাঁহাকে দাঁড়াইবার সময় পর্য্যন্ত না দিয়া মহা আহ্লাদে মুখভরা হাসি হাসিয়া আগে ভাগে রাজার সেই অনুগ্রহের কথাই পাড়িল। কিন্তু বেশী কথা তাহাদের বলিতে হইল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখের কথা মুখে, ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই তাহাদের মিলাইয়া গেল। শ্বশুরের ভ্রুকুটি-অঙ্কিত অন্ধকার মুখ দেখিয়া তাহারা সহসা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল,—জঙ্গু তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"জুমিয়া কুথা"?

জুমিয়ার স্ত্রী বলিল—"নিমতায় (নিমন্ত্রণে) গেলু?"

"কখন আস্থবে?"

"রাত কাটুবে।"

জঙ্গু আর কথাটি না কহিয়া গম্ভীর ভাবে উঠান হইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্বশুরের ভাব দেখিয়া বধূরা বিস্মিত ঈষৎ ভীত হইল।

সে রাত্রে জঙ্গু শয্যায় শয়ন করিলেন না, গৃহদ্বারের পার্শ্বে রোয়াকে শয়ন করিয়া রহিলেন,—অভিপ্রায় এই,—জুমিয়া গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি দেখিতে পাইবেন। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে জুমিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া, দ্রুত পদনিক্ষেপে অতি ব্যস্তভাবে তাঁহার সম্মুখের উঠান দিয়া একটি গৃহ মধ্যে ঢুকিল, জঙ্গুও উঠিয়া কিছু পরে সেই গৃহে গমন করিলেন—দ্বারস্থ হইয়া দেখিলেন, জুমিয়া ধনু-র্ব্বাণ লইয়া আবার গৃহের বাহিরে আসিতেছে। পিতাকে দেখিয়া জুমিয়া দাঁড়াইল। জঙ্গু বলিলেন—"কুথায় যাভিবি?"

তাঁহার স্বরে কি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য—জুমিয়া চমকিয়া গেল, বলিল—"শীকারে যাউছিনু—" জঙ্গু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"টুকুন সবুর করিয়া যা, কথাটা আছে"।

বলিয়া বজ্র মুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া তাহাকে বসাইলেন। জুমিয়ার কথা ফুটিল না, একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িল। জঙ্গু আবার বলিলেন—"বাছাডা মনে রাখুছু কতদিন বলুনু—'অগুণ' মুইদের ঘর না।"

জুমিয়া উৎসুক্য পূর্ণনেত্রে নীরবে মাথা নাড়িল। জঙ্গ বলিলেন "কত্তদিন বলুন্থ মনে •রাখুছু -তুইডার বংশডা খাট না, রাজ বংশে তুইডার জনম।"

জুমিয়ার মুখ জ্বলিয়া উঠিল, অধীর স্বরে বলিল "মনে আছু বাবাডা মনে আছু ! কত্তদিন—"

জঙ্গ তাহাকে কথা কহিতে না দিয়া বলিলেন—

"আর সেইডা মনে আছু ত কেমনি বিশ্ব (বিশ্বাস) ভাঙ্গি, কেমনি পীড়ন করি মুইদের ধন, মুইদের রাজত্বি চুরি করুল ! মুইদের তাড়াউল !"

জুমিয়া আর থাকিতে পারিল না—দীপ্ত স্বরে বলিল— "কিন্তু কোনডা সে চোর ? কত্তদিন এই কথা শুধাউছি বলুবি কবে ? শোধ নিবু কবে ? শোধ নিবু কোনডার উপর ? কুথায় মুদের সেই ঘর ? কুথায় সেই দেশ ? মুইদের রাজত্বি মুইদের করুব কখন ? এখনো কি সেডা বলুবার কাল আউল না ?"

জুমিয়ার সেই আগ্রহভাবে জঙ্গের হৃদয় আশ্বস্ত হইল। বলিলেন—"কাল আসুছে। এই ইদরডাই তুইডার দেশ, নাগাদিত্য রাজাডাই সেই চোরডার বংশধর, ইনাডারি-- পূবজন (পূর্ব্ব পুরুষ) মুইদের দেশ ধন, পরাণ সবিডা চুরি করুল, ইনারি দাদাডা মুদের তাড়াউল।"

জুমিয়ার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল—মুখ সহসা বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল—মহারাজ নাগাদিত্য যিনি জুমিয়াকে

এত ভালবাসেন,—যাহাকে বন্ধু বলিয়া জুমিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে—তিনিই তাহার প্রতিশোধের পাত্র! খানিক-ক্ষণ জুমিয়ার কথা বাহির হইল না, পরে বলিল "এত-দিন মুইরে এ কথা কেন বলুলি না বাবাডা?"

জঙ্গু এতদিন বলেন নাই তাহার কারণ ছিল, এতদিন তাঁহার পিতা বাঁচিয়াছিলেন। তিনি থাকিতে এ কার্য্যে হাত দিলে সফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কার্য্যের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হইবার অগ্রে জুমিয়াকে এ সকল কথা বলিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত সময়ে হঠাৎ উৎসাহে নীত হইয়া একটা কাজ করিয়া বসিলে তাহা কিরূপ বিফল হইবার সম্ভাবনা তাহা আপ-নার শৈশব-কার্য্য হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর আগে—ইদরে আসিবার জঙ্গুর উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি জানিতেন—জুমিয়ার নিকট ঐ কথা বলিলে সে তৎক্ষণাৎ ইদরে আসিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে। অথচ সে ছেলে মানুষ, শুধু উৎসাহেই কাজ হয় না, তাহাকে চালাইবার জন্য জঙ্গুর সঙ্গে থাকা চাই, নহিলে সমস্তই নিস্ফল হইয়া যাইবে।

তাহার পর ইদরে আসিয়াই বা এ কথা এতদিন জুমি-য়াকে বলেন নাই কেন? ইদরে আসিয়াই জঙ্গু গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া চারিদিক এই কার্য্যের উপযোগী করিতে গিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া একেবারে জুমিয়াকে সমস্ত

বলিবেন. সমস্ত বলিয়া তাঁহাকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, এই তাঁহার সংকল্প। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির যখন সময় আসিয়াছে তখন হঠাৎ পুত্রের মুখে এই কথা? জঙ্গু জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "কেন এই তুদিনডায় কাল ফুরই গেলু কি? রাজাডার দয়া না কি এ!"

দয়া! এ তীব্র উপহাস জুমিয়ার হৃদয় বিঁধিল, জুমিয়া বলিল "দয়া! না দয়া না, বিশ্বু (বিশ্বাস) বাবাডা বিশ্বু। যে মুইরে ভাইএর মত বিশ্বু করুল—মিতার মত ভালবাসুল তানারে কি করি মুইডা মারুব? বাবাডা, মুই পারুব না, রাজা অনেক দিন গেলু যাউতে দে, শোধ লউবার কাল অনেক দিন চলু গেলু যাউতে দে, এখন যানাডার দোষ নাই—"

জঙ্গু তীব্রস্বরে বলিলেন "বিশ্বু! গুহা কেমনি বিশ্বু রাখুল? তানাডারে যে মন্দালিক পরাণ চেয়ে ভাল বাস্থল সে ভালবাসার সে কেমনি শোধ দিল? কাপুরুষ! আজ রাজাডার একডা মিঠে কথায় পূবজনদের অপমান তুই ভুলুনি?'

জুমিয়া বলিল "না বাবাডা ভুলু নি, কিন্তু যে অপমান করুল সে কুথায় আজ? তানাডার দোষে আর জনডারে মারুলে শোধ কুথা?"

ভালবাসার মত শিক্ষক কেহ নাই, অসভ্য ভীলের নিকট আজ খাঁটি যুক্তি দ্বার খুলিয়া গেল। জঙ্গু আরো জ্বলিয়া উঠিলেন, এতদিন ধরিয়া যে অনবরত জুমিয়াকে

উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছেন সেই উত্তেজনার আজ এই ফল! বলিলেন—"তানাডার দোষ নাই! মুইদের সর্ব্বনাশে যানার রাজত্বি তানাডার দোষ নাই! মুইদের আপুনার ধন, পরাণ, দেশ যে চোরডার হাতে তানাডার দোষ নাই? সে চোরডার দু একডা মিঠে কথায়-তুইডা সব ভুলুলি?"

জঙ্গুর দুই নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল, জঙ্গুর উত্তপ্ত ক্রোধ তীব্রনিরাশার অশ্রুতে পরিণত হইল। জুমিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সে অশ্রুবারিতে তাহার হৃদয় দ্রব হইতে লাগিল, জুমিয়া বলিয়া উঠিল "বাবাডা কি করুব বল"?

জঙ্গু বজ্র গম্ভীর স্বরে দেয়ালের একটি তীর দেখাইয়া বলিলেন "ঐ তীরডায় গুহা মুইদের বাবা মন্দালিককে মারুল,ঐ তীর তুলি নে, ঐ তীরডায় রাজাডাকে বিঁধি শোধ নে, রাজত্বি রাখ।" তাঁহার শেষ কথা শেষ না হইতে হইতে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, বালিকা হর্ষের আতিশয্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বাবাডা আয় আয়, বর এসেছে"।

তাহার সেই হাসিতে সেই মৃত্যু গম্ভীর রুদ্ধ গৃহও যেন হাসিয়া উঠিল, নির্জীব স্তম্ভিত জুমিয়ার প্রাণে যেন সহসা প্রাণের আবির্ভাব হইল। বালিকা আবার 'আয় আয়' করিয়া বিষাদ স্তব্ধ গম্ভীর পিতার হাত ধরিয়া টানিল, জুমিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন

করিলেন। তাঁহার চোখে দুই ফোটা জল দেখা দিল। জঙ্গু বলিলেন—"মা টুকুন বাইরে যা তোর বাবা এখনি যাউছে"

বালিকা তাহা শুনিবার পাত্র নহে, কোল হইতে উঠিয়া বাবার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আবার বলিল—"না আয়, বর এসেছে—" জুমিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "বর কে"?

সে বলিল "রাজা। আয় বাবা"। জুমিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল, তার পর দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইল। জঙ্গু বিস্মিত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শীকার।

জুমিয়া আসিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিয়া যখন গম্ভীর নতমুখে দাঁড়াইল তখন তাহার সেই অবনত মুখের অন্ধকার দেখিয়া মহারাজ বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে জুমিয়া? আজ যে এত দেরী হইল?"

জুমিয়া মুহূর্ত্তকাল তেমনি অবনত দৃষ্টিতে থাকিয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইল, তাহার পর হঠাৎ পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাই ত সূর্য্যিটা উঠি গেল?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"তাইত! সে খবরটা এতক্ষণ পাও নাই?"

সভাসদগণ হাসিল, জুমিয়াও হাসিতে চেষ্টা করিয়া আবার মুখ নত করিল। মহারাজ বলিলেন "আর বিলম্ব কেন? অশ্বে চড়িয়া লও—"

জুমিয়ার জন্য একটি সজ্জিত অশ্ব লইয়া একজন অশ্বপাল দাঁড়াইয়াছিল, জুমিয়া সেই অশ্বে উঠিলে মহারাজ তাঁহার অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন, নিমেষে শত শত অশ্বপদ গ্রাম প্রান্তর কাঁপাইয়া তাঁহার অনুগমন করিল, জুমিয়াও একটি কলের সিপাহীর ন্যায় তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল।

বন বেশী দূর নহে, বৃহৎ অরণ্য বড় বড় গাছে পূর্ণ। বনে শাল আছে, সেগুণ আছে, দেবদারু আছে, ঝাউ আছে, মন্দার আছে, ইহা ছাড়া অপরিচিত বন্য গাছ কত রকমের আছে তাহার সীমা নাই। বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, আগা গোড়া পাতায় ঢাকা সরল—সুদীর্ঘ, স্বল্প পত্র স্বল্প-শাখা প্রকাণ্ড গুঁড়ি—এইরূপ নানা জাতীয় বন্য বৃক্ষে বন ঢাকিয়া আছে। গাছে গাছে—শৈবাল ঝুলিতেছে, কোন কোন গাছ ফুটন্ত পরগাছায় আগাগোড়া ঢাকা, কোথায় একটি হলদে ফুলের লতা দুই তিনটি গাছকে একত্র বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহাদের গায়ে ফুলের তারকা ফুটাইয়াছে। ফুলে ফুলে মক্ষিকা গুণ গুণ

করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুই গাছের মাঝে মাঝে প্রায়ই বড় বড় এক একটি গোলাকার চাদের মত মাকড়-শার জাল--তাহা শিশির বিন্দুতে পূর্ণ। গাছের ফাঁক দিয়া তাহাতে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, প্রভাতপবনে ঈষৎ কাঁপিতে কাঁপিতে রৌদ্রকিরণে তাহা ঝলমল করিয়া উঠি-তেছে। কোন কোন ঝাঁকড়া গাছ শাদা মুকুলে ভরা,—কোন কোন গাছ ঘন ঘোর লাল পাতার মুকুট পরিয়া আছে—দুর হইতে তাহা ফুল বলিয়া মনে হয় কিন্তু কাছে আসিলে সে ভ্রম দূর হয়। আকাশে মেঘের বৈচিত্র্যের ন্যায় ফুল পত্রের এই বর্ণ বৈচিত্র্যে শ্যাম অরণ্যে অপরূপ শোভা বিকশিত হইয়াছে ; আর এই নানা শোভার, নানা রকমের, নানা আকৃতির গাছে গাছে মিলিয়া মিশিয়া আকাশ যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই এক ছত্র একাকার অসংখ্য বৃক্ষের মাঝে মাঝে এক একটা পত্র-হীন—নিতান্ত অদ্ভুত আকৃতির গাছ আগা গোড়া শৈবালা-বৃত হইয়া, গুড়ির মত দুই চারিটী মাত্র মোটা মোটা শাখা বাহির করিয়া—উচ্চ অরণ্যের মাথার উপর আরো দুই চার হাত উচ্চ হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে দূর হইতে তাহার দিকেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই শৈবালাবৃত শুষ্ক প্রায় প্রকাণ্ড দৈত্যতরু দেখিলে মনে হয়, সে যেন তাহার শৈবাল লোমশালী শাখা হস্ত বাড়াইয়া অরণ্যের প্রহরীতায় নিযুক্ত।

অরণ্যের বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন এই ঘন বদ্ধ বৃক্ষাবলীর মধ্যে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারে না—কিন্তু যতই নিকটবর্ত্তী হও ততই নিবিড়তা যেন দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া পথিককে পথ দেখাইতে থাকে, অরণ্যে প্রবেশ করিলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কেমন প্রশস্ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক এক স্থান এত প্রশস্ত যে আট দশ জন অশ্বারোহী নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব চালনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। অরণ্য ও জঙ্গলের মধ্যে এই একটি বিশেষ প্রভেদ—জঙ্গলে পথ মেলেনা অরণ্যের ভিতর প্রশস্ত স্থান। এইরূপ প্রশস্ত স্থানে তৃণক্ষেত্র, তৃণক্ষেত্রের মাঝে মাঝে শ্বেত পীত নীল কত রকম সুগন্ধ তৃণ ফুল, কত রকম সুগন্ধ গাছড়া। বন্য ছাগলেরা তৃণ খাইতে খাইতে কত ফুল কত গুল্ম দলিত করিয়া রাখিতেছে। এক একটি বৃক্ষতল ফলে ফলে বিছান, খরগোষেরা এক একটা ফল সমুখের দুই পায়ে ধরিয়া টুক টুক করিয়া খাইতে বসিয়াছে, মাঝে মাঝে কাল কাল এক একটি কাঠবিড়ালী আসিয়া এক একটা ফল মুখে লইয়া তাড়াতাড়ি গাছের উপর উঠিতেছে। পাহাড়ের গাত্রে কোন কোন স্থানে গাছ পালার মাঝে মাঝে এক একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী। একটা প্রণালী দিয়া নীচে জল পড়িতে পড়িতে পাহাড়-প্রাচীরের নীচে একটা গুহার মত হইয়াছে। একটা হরিণ সেইখানে

শান্তিতে জল পান করিতেছে। গাছের মধ্যে পাখীরা বসিয়া গান করিতেছে; ঝিঁঝিঁ পোকা অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ করিতেছে, স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্যের শিরায় শিরায় যেন তাহার প্রশান্ত প্রাণ সঞ্চালিত হইতেছে, সেই প্রাণের মধ্যে নির্ভয়ে শত সহস্র জীব আশ্রয় লইয়াছে।

সহসা এই প্রশান্ত গম্ভীর অরণ্য ভূমির অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল, শীকারীদের পদদাপে অরণ্য কাঁপিয়া উঠিল। জীব জন্তু কে কোথায় পলাইবে ঠিক নাই, পাখীরা কোলাহল করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; ছাগগণ লাফে লাফে ছুটিয়া অরণ্য ছাড়াইয়া পাহাড়ের উঁচু উঁচু ধারে আসিয়া উঠিতেছে, ক্ষুদ্র খরগোষেরা রাঙ্গা চক্ষু বাহির করিয়া কম্পিত কলেবরে গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িতেছে, মহিষ এক একটা পথ হারাইয়া বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা প্রকাণ্ড গর্জ্জন করিয়া শিং বাঁকাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে। ঐ হরিণ সমুখ দিয়া চলিয়া গেল, ঐ একটা নেকড়ে বাঘ পার্শ্বের বন মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। কিন্তু এ সকল জীবের প্রতি আজ শীকারীদের বড় দৃষ্টি নাই, ইহাদের মধ্যে সহসা কোন একটি মাত্র কোন শীকারীর অযত্ন-নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হইয়া ভূমি শায়িত হইতেছে, আর সকলে পলায়নের অবসর পাইয়া বাঁচিয়া যাইতেছে। বরাহই আজিকার প্রধান শীকার—এক একটি বরাহের পশ্চাতে শীকারীগণ চৌদিক হইতে

ছুটিতেছে, ছুটিতে ছুটিতে বৃক্ষগাত্রে কাহারো অশ্বের গাত্র ঘর্ষিত হইয়া যাইতেছে, শাখায় বাধিয়া কাহারো উষ্ণীষ খুলিয়া পড়িতেছে। একজনের অশ্ব গাছে ঠোকর খাইয়া আরোহীকে ফেলিয়া দিল—সেই ভূপতিত শীকারীর চোখের উপর দিয়া অন্য অশ্বারোহীগণ বিস্তৃত একটা গহ্বর প্রণালী উল্লম্ফনে পার হইয়া গেল।

একজন শীকারী বর্ষাঘাতে একটি বরাহ্‌শিশু বিদ্ধ করিয়া বর্ষা তুলিতেছিল, হঠাৎ আর এক জনের বর্ষা তাহার বাহুর মাংস বিদ্ধ করিয়া আবার সেই বরাহের গাত্র বিদ্ধ করিল। এই সময় আর একটা বরাহ পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, শীকারী বাহুর শোণিত প্রবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ধাবিত হইল। মহারাজ সর্ব্বাগ্রেই একটা বরাহের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন।

এই শ্রান্তিহীন উৎসাহ কোলাহলের এক প্রান্তে জুমিয়া একাকী কেবল তাহার নিরুৎসাহ, বিষাদভার লইয়া একটা পাষাণ দর্শকের ন্যায় অশ্ব পৃষ্ঠে স্তব্ধ বসিয়াছিল। তাহার চারিদিকে উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, উন্মত্ততা; শীকারের ছুটাছুটি, শীকারীর চীৎকার-অনুসরণ। এই উন্মত্তকারী শীকার-দৃশ্য অধীর স্বরে ক্রমাগত তাহাকে নিজের দিকে ডাকিতেছে। অশ্ব অধীর হইয়া হ্রেষারব করিয়া উঠিতেছে, অশ্বারোহী তাহাকে টানিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিতেছে—

"আর না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন আর

তোমরা কেহ জুমিয়াকে আমোদের জন্য ডাকিও না, তোমরা তাহাকে এখন তোমাদের অন্ধকার ভ্রূকুটি দেখাও, সে যে ভয়ানক ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হউক।”

নিকট দিয়া একটা হরিণ চলিয়া গেল হঠাৎ জুমিয়ার হাতের রাশ শিথিল হইয়া পড়িল, অশ্ব চারি পা তুলিয়া ছুটিবার উদ্যোগ করিল আবার তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় মহারাজ একবার ছুটিয়া জুমিয়ার কাছ দিয়া চলিয়া গেলেন। হঠাৎ যেন মহারাজের কণ্ঠ নিঃসৃত ‘জুমিয়া জুমিয়া’ আহ্বানে বন-তল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার কঠিন প্রাণও যেন বিগলিত হইয়া উঠিল, দুদিন আগের মত মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু দুদিন কি আর এখন আছে? সে ত বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। এখন ত আর নাগাদিত্য বন্ধু নহেন, পিতা কহিয়াছেন—এখন নাগাদিত্য তাহার শত্রু, সে যে আজ তাঁহাকে মারিতে আসিয়াছে। সে ডাকে আজ আর তাহার পা সরিল না—কে যেন তাহাকে ধরিয়া পাষাণের মত সেইখানে অচল করিয়া রাখিল, মহারাজ চলিয়া গেলেন; সে কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মহারাজ বরাহ বিদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন—চারিদিকে একটা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছে—মহা

রাজ জুমিয়ার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"জুমিয়া, তুমি আজ এত শ্রান্ত! কত শীকার করিলে?"

জুমিয়ার দৃষ্টি আবার নত হইয়া পড়িল, তাঁহার দিকে চাহিতে আর যেন তাহার সাহস নাই, সে বলিল—"শীকার কই আজ হউল, পারুল না আজ?"

জুমিয়া আজ শীকার করে নাই, মহারাজ বিস্মিত নিরানন্দ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সভাসদেরা যে আজ জুমিয়ার সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া লইবে তাহা মহারাজের অসহ্য। এই সময় একটা হরিণকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখা গেল—রাজা বলিলেন—"জুমিয়া, হরিণ হরিণ, মার মার, ছুট, ছুট।"

জুমিয়া অস্বাভাবিক স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—হাঁ মারুব মারুব।"

কিন্তু অশ্ব ছুটাইল না, কেবল হাতের ধনুক তুলিয়া হঠাৎ উঁচু করিয়া ধরিল। ধনুকে যে বাণ অর্পণ করিতে হইবে তাহাও ভুলিয়া গেল। ধনুক মহারাজের প্রতিই যেন লক্ষ্য-নিবদ্ধ হইল—কিন্তু রাজা নির্ভয়ে হাসিয়া বলিলেন—"জুমিয়া বাণ কই? শীঘ্র শীঘ্র!" ইতিমধ্যে আর একজন হরিণকে বাণাহত করিল, রাজার মুখ মলিন হইয়া গেল, চারিদিকের জয়ধ্বনি উঠিয়া থামিয়া গেল—রাজা অধীর হইয়া বলিলেন—'জুমিয়া ইচ্ছা করিয়া মারিল না—জুমিয়ার আজ কি হইয়াছে!"

জুমিয়া যে রাজাকে মারিতে যাইতেছিল—এখনো তাঁহার এই ভালবাসা! এই বিশ্বাস! জুমিয়া আর পারিল না, তাহার অশ্রু উথলিয়া উঠিল, সে ধনুক আবার স্কন্ধে ফেলিয়া বলিল "সত্যি মুই নারিনু, মহারাজ আজ্ঞা দে চলু যাই।"

মহারাজ তাহার অশ্রুজলে, তাহার সেই বিষাদের স্বরে আরো ব্যথিত হইলেন, বুঝিলেন আজ শীকারে অকৃত-কার্য্য হইয়া জুমিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে। পাইবারই ত কথা! মহারাজ বলিলেন—"জুমিয়া আজ তোমার কি হইয়াছে?"

জুমিয়া বলিল "মহারাজ মুইডার অসুখ হউছে; মুই আর দাঁড়াউতে নারুছি।"

জুমিয়া অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেল। মহারাজের সেদিন শীকারের অর্দ্ধেক আমোদ নষ্ট হইল। সভাসদদিগের আর সে দিন আহ্লাদে ধরিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নৈরাশ্য।

সুদুর্গম বনমধ্যে সুপ্রশস্ত মুক্ত ভূমি। এই মুক্তভূমির একদিকে নিবিড় অরণ্য পথ, অন্য তিন দিকে পাহাড়ের সোজা সোজা পাষাণ প্রাচীর। প্রাচীরের বাহির-পৃষ্ঠ বৃক্ষ

পূর্ণ কিন্তু ভিতরপিঠ এমন উলঙ্গ তৃণপত্রহীন যে দেখিলে মনে হয় কে যেন করাত দিয়া পাহাড় গাত্রকে এখনি এমন মসৃণ করিয়া কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই উলঙ্গ সোজা সোজা পাহাড়ের গায়ে গায়ে মৌমাছির বড় বড় লাল চাক, তাহার কাছে কাছে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর। গহ্বর নিশাচর পক্ষীতে পূর্ণ।

একটি পাহাড় গাত্র হইতে একটি জল প্রপাত পড়িতেছে—পড়িয়া নীচে একটি জলাশয় হইযাছে, জলাশয় হইতে একটি সঙ্কীর্ণ জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া বড় বড় প্রস্তব খণ্ডের মধ্য দিয়া অদূর অরণ্যের পাদপমূল ধৌত করিয়া কে জানে কোথায় বিলীন হইয়া পড়িতেছে।

আজ অন্ধকার রজনীতে এই নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুদুর্গম জলাশয় তটে ধূধূ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে, আগুণের চারি পাশে বিদ্রোহী ভীলেরা বসিয়া ধীরে ধীরে কথা বার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের বহু জনের সেই গুণ গুণ শব্দে অরণ্য যেন চমকিয়া উঠিতেছে, নির্ঝর প্রপাত আর শুনা যাইতেছে না—এই বিজন প্রদেশের নিস্তব্ধতা যেন সহসা কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া রাঙ্গা চক্ষু মেলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের চুপি চুপি কথা আর রহে না—বিলম্ব যেন আর সহে না। কি জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল—আর যেন সে অপেক্ষায় থাকিতে পারে না। তাহা-

দের অধীর উৎসাহ সেই অন্ধকার নিশীথের আগুনে তাহাদের মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে—তাহারা আর পারে না—সে উৎসাহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। রাজা দূরে, বিপদ দূরে,—নিকটে কেবল তাহারা আপনারা এক সংকল্পী বদ্ধ পরিকর সশস্ত্র দল, আর তাহাদের আপনাদের উৎসাহ ও অভীষ্ট জয়। এ অবস্থায় তাহাদের চুপি চুপি কথা আর কতক্ষণ চুপি থাকে? তাহাদের অধীরতা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, তাহাদের মৃদুস্বর ক্রমশই স্ফীত হইয়া বন্যার মত অল্পে অল্পে বন-প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, দলপতি ব্যস্ত হইয়া বারম্বার 'শান্ত হও শান্ত হও' করিয়া তাহাদিগকে থামাইতে লাগিলেন, এবং সতৃষ্ণ উৎসুক নেত্রে অরণ্য পথের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

সহসা অরণ্যের এই অস্পষ্ট কোলাহল স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অদূর অরণ্য হইতে একবার তীক্ষ্ণকণ্ঠ 'কু'ধ্বনি উত্থিত হইল—মুহূর্ত্তে বিদ্রোহীগণ থামিয়া পড়িল—এই 'কু'ধ্বনি বন প্রান্তে মিলাইয়া পড়িতে না পড়িতে চারিদিক সুগভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল,—রুদ্ধশ্বাস নির্ঝর কেবল এই স্তব্ধতায় প্রাণ পাইয়া সজোরে নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে আবার জল প্রপাতের গভীর শব্দ স্তব্ধ অরণ্যের প্রাণে তান তুলিল। দলপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন যুবক বাম হস্তে মশাল—দক্ষিণ হস্তে যষ্টি লইয়া অরণ্যপথে জলাশয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়া-

ইল—তাহাকে একাকী দেখিয়া বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ-ভাব সহসা তাহাদের প্রক্ষিপ্ত ছায়ার মত মলিন হইয়া গেল। দলপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"জুমিয়াডা কই?" উত্তর হইল "তানারে খুঁজি মিলুলু না।" জঙ্গুর হৃৎকম্পন শব্দ সেই বিজনতার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন—"খুঁজি মিলুলু না? গেলু কুথা?

"কোনডা বলুতে নারুল।"

"বহুডা?"

"বহুডা নাই। মেয়েডা নাই। তানাদের বুঝি লউ গেছু?"

শুষ্ক পত্রের আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু একটা বাতাস উঠিলেই সহসা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেমন নিভিয়া যায় তেমনি উক্ত সংবাদে ভীলদিগের প্রদীপ্ত মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। কিন্তু যে বাতাসে শুষ্কপত্র অগ্নিহীন হয় সেই বাতাসে কাঠের আগুন আরো জ্বলে বই নেভে না। লঘুদ্রব্য যেমন সহজে ধরে তেমনি সহজে নিভে—ভারী জিনিসে একবার আগুণ ধরিলে আর রক্ষা নাই। জঙ্গু যখন শুনিলেন জুমিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই জুমিয়া—যাহার উপর তিনি সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে হৃদয়ের শোণিত দিয়া এতদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই জুমিয়া আজ তাঁহার সমস্ত আশা ভাঙ্গিয়া, সুখস্বস্তি হরণ করিয়া কৃতঘ্ন পাষণ্ডের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে—

তখন মুহূর্ত্তকাল তিনি বজ্রাহতের ন্যায় নিস্তব্ধ জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন,—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাঁহার সে ভাব চলিয়া গেল, তাঁহার সে নিস্তেজতা মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সত্য বটে তিনি জুমিয়াকে ভালবাসেন,—কিন্তু তাঁহার ব্রতকে তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। এই ব্রত তাঁহার জীবন, জুমিয়া এই জীবনের সুখ মাত্র। ইহা তাঁহার প্রেম, জুমিয়া এই প্রেমের আধার মাত্র। ইহা তাঁহার আশা, জুমিয়া এই আশার ভরষামাত্র। ইহা তাঁহার তৃষ্ণা—জুমিয়া এই তৃষ্ণার জল মাত্র। সুতরাং সুখ শান্তি পানীয় হারাইয়া মুহূর্ত্তকাল জঙ্গু অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু যন্ত্রণা-কাতর পিপাসিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার উত্তেজনা আরো বাড়িয়া উঠিল। সেই যন্ত্রণা সেই পিপাসা অন্য উপায়ে নিবৃত্তি করিবার স্পৃহা আরো বাড়িয়া উঠিল। বাধা পাইলে দুর্ব্বল যে,—সে নুইয়া পড়ে—কিন্তু সবল আরো ভীষণ হইয়া উঠে। জঙ্গু অসভ্য—কিন্তু সবল হৃদয়, দৃঢ় উদ্দেশ্যধারী।

জঙ্গু উত্তেজিত অথচ সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন "জুমিয়া ভীরু! জুমিয়া অমনিষ্যি! (কাপুরুষ!) সেডা গেলু যাক্, তানাডারে মুইরা চাহ না, এখন কোনডা রাজা হুউবি বল?"

নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার কথা ধ্বনিত হইয়া নিস্তব্ধতায়

মিশাইয়া গেল, বিদ্রোহীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কেহ একটি কথা কহিল না, কেহ একপদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল না। জঙ্গু আবার বলিলেন "ভীরু উহার মুখ চাহু কি তুইরা এ কাজে লাগুতে আউলি? তাহারে না পাই সব হাল ছাড়ুবি?

বুল্লু বলিল—"মুরা রাজা চাই, কানার সাথে মুরা কাজে লাগুবু?"

চারিদিকে অমনি একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উত্থিত উঠিল "মুরা রাজা চাই—মুরা রাজা চাই।"

জঙ্গু বলিলেন "কোনডা তুইদের মাঝে রাজা হউবি আয়, এই বাণ লউ কিরে কর—"

জঙ্গুর কথা শেষ না হইতে আর একবার কোলাহল উঠিল "মুরা রাজা চাই—রাজা চাই" কিন্তু কেহ রাজা হইতে অগ্রসর হইল না। জঙ্গু তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যেডা গেল সেডা মুইডার ছাবাল না, আয় বেটা তুইডা রাজা হউবি।

চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল, জঙ্গু কটী হইতে একটি বাণ খুলিয়া হাতে ধরিয়া সেই গম্ভীর নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"এই বাণে মন্দালিককে গুহাডা মারুল এই বাণ হাতে লউ কিরে কর গুহাডার বংশ উজড় করি দেশ বাঁচাউবি—"

পিতার প্রতিধ্বনির মত কম্পিত কণ্ঠে পুত্র ধীরে ধীরে

সেই শপথ আওড়াইয়া গেল। আর কেহ একটি কথা কহিল না—একবার জয়ধ্বনি উঠিল না, চারিদিকের নিরুৎসাহের মধ্যে গুরুর শপথ বাণী ধ্বনিত হইয়া আস্তে আস্তে মিলাইয়া পড়িল। নিভনিভ আগুণের আলোকে পাষাণ প্রাচীরের দীর্ঘ ছায়া জলাশয়ে ফুটিয়াছিল, স্তব্ধ বিদ্রোহীদের চোখের উপর কেবল তাহা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, আর তাহাদের মাথার উপর এক একটা চামচিকা ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * *

সকলে চলিয়া গেছে, ভোর হয় হয়—কিন্তু এখনো অবন্য অন্ধকার, জটিল বৃক্ষভেদ করিয়া এখানে এখনো উষার আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই, পাখীরা অন্ধকারেই গান গাহিয়া উঠিয়াছে, বনফুলের সুগন্ধ অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। একাকী জঙ্গু এই সময় অরণ্যতলে একটি শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন—"দেবতা এখনো তুইডার এমনি কারখানা! মুইদের কি ঘুম দিউবিনে? মুইদের ছাড়ি তুইডা তানাদের হইলি? তানাদের বড় করিলি? মুইদের ধন তানাদের দিলি? তুদের ছাবাল কাঁদি মরুছে তুইডা তানাদের পানে চোখ চাহিলি নে? এখনো চাহবি নে? তুইকে সোনায় মড়াইবু, তুইডার তলায় হাজার ছাগ বলি দিবু, মুদের পানে ফিরু চাহ—মুদের দুখ

তাড়াউ দেবতা! মুদের তুই ঘুম দে—মোরা তুইডারই ছাবাল!” •

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভণ্ডুল।

পৃথিবীর যখন যে দেশে কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধি হয়, প্রায় একজনের দ্বারাই হইয়া থাকে, দেশের অন্তর নিহিত সমগ্র রুদ্ধ শক্তি দিয়া সময় যে ক্ষুদ্র একজনকে গঠিত করিয়া তোলে, তাহার শক্তি তরঙ্গিত হইয়া দেশের শত সহস্রকে সঞ্চালিত, অনুপ্রাণিত করে।

ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে যে রাষ্ট্র বিপ্লবে প্রাণ হারাইলেন নেপোলিয়নের কটাক্ষপাতে সেই বিপ্লব স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই শক্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ম্যাটসিনি সমগ্র ইটালি উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন, ওয়ালেস স্কটলণ্ডকে স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ ভারতেশ্বর আকবরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আর ইহার অভাবেই, সিরাজউদ্দৌলার সহস্র সৈন্য, বাঙ্গলার কোটী কোটী লোক বিনাযুদ্ধে ক্লাইবের নিকট নতশির হইয়াছিল। তাই বলিতেছি বিদ্রোহী ভীলেরা যে “রাজা চাই” বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল তাহা অকারণে নহে। জংলা তাহা-

দের রাজা হইল বটে—কিন্তু রাজার গুণ তাহাতে কিছুই ছিল না—যে দীপ্ত উৎসাহ দেখিয়া তাহারা উৎসাহ পাইবে এমন উৎসাহ তাহার কই? যে দৃঢ় সংকল্প যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালেও সৈনিকদিগকে অটল রাখিতে পারে—এমন সংকল্প তাহার কই? যে বীরত্ব, সাহস দেখিয়া সৈনিকেরা জীবন মরণে তাহার ভক্ত হইয়া দাঁড়াইবে—এমন সাহস তাহার কই? জুমিয়া তাহাদের মনের মত অধিনায়ক ছিল, জুমিয়ার কটাক্ষ চালনে তাহারা উত্তেজিত হইতে পারিত, তাহার অটল সাহস দেখিয়া নির্ভয়ে তাহারা মৃত্যুর অনুসরণ করিতে পারিত, সে অধিনায়ক নাই সে জুমিয়া নাই, বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ আর কে ধরিয়া রাখে? জঙ্গুর উৎসাহ বাক্যে তাহার দেশানুরাগ-বাক্যে মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—তিনি এক পা সরিয়া গেলে আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাহারা কেবল কথা চায় না, তাহারা একজন সঙ্গের সঙ্গী কর্ম্মের কর্ম্মী অধিনায়ক চায়, জঙ্গু তাহা পারেন না, শপথে তাহার হাত পা বদ্ধ।

দিন যাইতেছে, মাস যাইতেছে, জঙ্গু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কত পরামর্শ হইতেছে, কত সংকল্প হইতেছে, কিন্তু কাজের সময় সকলই ভণ্ডুল হইয়া পড়িতেছে। পরামর্শের সময় যাহারা অধিক আস্ফালন করে, মুহুর্মুহু নাগাদিত্যের মস্তক চিবাইতে থাকে, উৎসাহের

উন্মত্ততায় সম্মুখের গমনশীল নিরীহ শৃগাল কুকুরকে বাণা-হত না করিয়া ছাড়ে না, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে সরিয়া পড়ে। সেই সময় তাহাদের আত্মাভিমান মস্ত হইয়া উঠে, জঙ্গু কোন দিন নাংলুর সহিত আগে কথা না কহিয়া কাংলুর সহিত কহিয়াছেন, ভদিয়ার মত যোগ্য লোক থাকিতে খুদিয়াকে হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়াছেন, এই রকম শত সহস্র কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায় জঙ্গু যে নিতান্ত মতলব করিয়া যোগ্যদিগকে ছাঁটিয়া অযোগ্যদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন সে বিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ থাকে না, একটা রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির বিপ্লবের মধ্যে সমস্ত একতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, কাজের সময় সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়ে।

একদিন সব স্থির, দোলোৎসব নিশিতে উৎসবোন্মত্ত সৈনিকেরা সিদ্ধিপানে বিহ্বল হইয়া থাকিবে, ভীলেরা ধীরে ধীরে দুর্গে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ অস্ত্রাগার আক্রমণ করিবে। সন্ধ্যার সময় শালবৃক্ষ তলে সকলে একত্র হইয়া সেখান হইতে সকলে শুভ যাত্রা করিবে।

জঙ্গু, তাহার পুত্র ও কতিপয় বন্ধুর সহিত সন্ধ্যা হইতে অন্য সকলের অপেক্ষায় শালবৃক্ষ তলে আসিয়া বসিয়াছেন। রাত্রি হইল তবু কাহারো দেখা নাই। জঙ্গু বুঝিলেন একটা কি গোল হইয়াছে। নিরাশ হৃদয়ে তাহাদের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। পূর্ণিমা রাত্রি, জ্যোৎস্নায় দূর দূরান্তর একখানি

স্বপ্ন দৃশ্যের মত নেত্রপথে পড়িতেছে, দূরের অস্পষ্ট উৎসব-কোলাহল জঙ্গুর নিরানন্দ হৃদয়ে একটা ভীতি জাগরিত করিতেছে, তিনি দ্রুতগতিতে চলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, হঠাৎ যেন নিকটের কোথা হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি একটু দাঁড়াইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, কিছুদূর গিয়াই অদূরের একটি বৃক্ষতলে জনতা দেখিতে পাইলেন, সেইখানে দাঁড়াইলেন, তাহারা যেমন কথা কহিতেছিল কহিতে লাগিল, দুই তিন জন তাহার মধ্যে প্রধান বক্তা, আর সকলেই শ্রোতা, একজন কহিল—"তুইরা যাউতে চাস ত যা, মুই ত না"—

দ্বিতীয় জন কহিল "মরুবার সময় মরিবু মোরা, আর রাজা হইবার বেলায় তানার ছেলেডা!"

ক্রুদ্ধ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন কহিল—"মরিবুই বা কেন মোরা? এ রাজার রাজ্যে মুইদের কষ্ট কি!"

আর একজন বলিল—"তার তরে মরিবু কেন মুরা? কানাডার লাগিন মরিবু, জুমিয়া থাকিত ত সে জুদ কথা"—

প্রথম বক্তা বলিল—"কিন্তু জংলা রাজা হউল কোন গুণটায়? মোরা কি সেইডার চেয়ে কিছু কম!"

দ্বিতীয় বক্তা বলিল—"মুইরা এতটাই কি ফেলা ছ্যাড়া। সেদিন কাল্লু মোদের দিকে পিছন করি বসিল, কেন তানাটা কি কথা কইতে নারিল?"

সকলে গস গস করিযা উঠিল—বলিল "মুরা কেউ যাউব না"

এই সময় জঙ্গু তাহাদের নিকটে আসিযা দাঁড়াইলেন, সকলে বলিল—"জঙ্গুডা, মরিবু মইরা—রাজা হউবে তোর ছেলেডা! তোরা রাজা হইবার লাগিন মোদের মরুতে লউ চলুছিস" ?

জঙ্গু দৃঢ় স্বরে বলিলেন "ছাবালরা শোন. তুইদের পরাণ বাঁচাউতেই তুইদের মরুতে ডাকুছি। পরাণ যদি না দিব তবে পরাণ রাখিবু কেমনে! চোরের হাত হউতে ঘর বাঁচাউতে—ছাবাল বাঁচাউতে তোরা পরাণ দিউবি—মুই ডার লাগিন না।"

দশকণ্ঠ একস্বরে বলিয়া উঠিল—"তবে তুইডার ছাবাল কেন রাজা হউব ? নাংলু তানাব চেয়ে কম কি ?"

সে দিন তাহারা নিজেই যে কেহ রাজা হইতে অগ্রসর হয় নাই, সে কথা তাহারা ভুলিল। জঙ্গু বলিলেন—

"মুইরা চিরদিনকার রাজা—তাই তুইরাই সে দিন মুইদেব রাজা করুলি। মুইবা তুইদের বাচাউতেই সামনে রহুব, বিপদ আসুলে মুইদের উপরেই পড়ুবে। আচ্ছা, নাংলুই রাজা হউল, মুইরা তানাডার আজ্ঞাকারী।"

সকলের মুখ যেন মেঘ মুক্ত হইল, সকলের আহ্লাদের মধ্যে নাংলুই নেতা হইল। কিন্তু ইহাতেও কাজ বড় একটা অগ্রসর হইল না। দুর্গ আক্রমণের সঙ্কল্প সঙ্কল্প-অবস্থাতেই

ক্রমে মরিয়া গেল। সকলের মতে বিশেষতঃ নাংলুর মতে তাহা বড়ই কঠিন ব্যাপার, কাজেই তাহারা এ সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য নানারূপ সহজ উপায় স্থির করিতে লাগিল। একদিন স্থির হইল রাজা যখন স্নানে আগমন করিবেন তখন বিদ্রোহীরা তাহাকে আক্রমণ করিবে। পরামর্শের সময় নাংলু মহা উৎসাহ প্রকাশ করিল, কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একেবারে বাঁকিয়া বসিল। বলিল—সে নেশা হইয়াছে বলিয়া সকাল বেলা সূর্য্যের আলোকে রাজাকে বধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইতে আসে নাই। এ সমস্তই জঙ্গুর শঠতা, তাহাকে রাজা করিয়া জব্দ করিবার জন্য জঙ্গু এরূপ ফন্দী করিতেছে। সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল, প্রভাতে রাজা স্নান করিয়া গৃহে গেলেন, জনপ্রাণী তাঁহার পথে উঁকি মারিল না।

এইরূপে ক্রমাগত উপায়ের উপর উপায় স্থির হইতে লাগিল, পরামর্শের উপর পরামর্শ চলিতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে বৎসরের পর বৎসরও কাটিতে লাগিল, কাজে কিছুই হইয়া উঠিল না। জঙ্গু দিন দিন হতাশ অবসন্ন হইতে লাগিলেন, জংসার অক্ষমতা প্রতিপদে বুঝিতে লাগিলেন, দেখিলেন লোকের মত লোক নাই। বিপদের মুখোমুখী হইতে পারে এমন একজন নাই, এমন কেহ নাই যে সূর্য্যের মত আপনার তেজে সকলকে তেজস্বী করিতে পারে। অধীনতায় সকলে অবসন্ন নিস্তেজ, কার্য্য-

ক্ষেত্রে আগুয়ান হইতে তাহারা অপারক, কেবল অপারক নহে অধিকং ভাগ অপদার্থ, তাহারা ভাল করিতে পারে না মন্দ করে. কিন্তু এখন তাহাদের দল হইতে তাড়াইলেও মঙ্গল নাই, তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে যদি বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া দেয়—ত অঙ্কুরেই সমস্ত নির্ব্বাপিত হইবে। প্রতিদিন হতাশ হইয়া জঙ্গু জুমিয়ার অভাব প্রাণপণে অনুভব করিতে লাগিলেন।

তবুও জঙ্গু আশা ত্যাগ করিলেন না, প্রতিপদে ব্যর্থ হইয়া প্রতি তরঙ্গে আহত হইয়া তবু হাল ধরিয়া রহিলেন। একে একে বিদ্রোহীগণ সরিয়া পড়িতে লাগিল, দল ভাঙ্গিয়া গেল, পরামর্শের জন্যও আর কেহ আসে না, নিমন্ত্রণ করিলেও জঙ্গুর গৃহ কেহ মাড়ায় না, তখনো জঙ্গু নিরাশার আশা ধরিয়া উত্তেজিত হৃদয়ে সবলে হাল ধরিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাণাঘাত।

জঙ্গু কহিলেন, "কাল রাজাটা শীকারে যাউবে মুই জানি আসিছি"।

জংলা বলিল—"কিন্তু আর কোনডা যে আসুতে চাহে না"—

জঙ্গুর গম্ভীর ললাটে ক্রোধের রেখা পড়িল—বলিলেন, "জুমিয়া থাকুলে কি এরূপ বলুত?" তুইডাকি কি কোনডা না?"

জংলা থতমত খাইয়া বলিল—"কিন্তু মুইডা একা"—

"একা তুইডা? একডাকে মাকতে কয়টা চাই? এত্তদিন বাণ ধরুত্তে শিখিলি কি লাগিন? জুমিয়া থাকুলে এ পাঁচ বরিষ কি মিছা যায়?"

জংলার চোখে জল আসিল—জঙ্গু বলিলেন—"যদি ডর লাগে ত সেইডা বল, আর যদি ডর না লাগে যদি যাউতে চাউস ত শুধু একা যা। মুরা খুব শিখিনু—মেলা জনডায় শুধুই গণ্ডগোল—আবার কেন লোকজন!"

জংলা বলিল "তবে যা বলুস—কাল মুইডা একাই যাউব।"

পিতাপুত্রে সে রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত্র ধরিয়া কার্য্য

সিদ্ধির পরামর্শ চলিল। অবশেষে গভীর রাত্রে জঙ্গু আশায়, নিরাশায় উদ্বিগ্ন হইয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন।

জংলা বিদায় হইল, পিতার দিকে চাহিয়া বিদায় হইল—আর কাহারো সহিত দেখা করিয়া গেল না, গৃহের দিকে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিল না, তাহাতেও যেন তাহার সাহস নাই। যখন পিতার নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িল—তখন একবার ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু তাহার অন্ধকার হৃদয়ের অন্ধকার ছাড়া তখন আর কিছুই দেখিতে পাইল না, জংলার রুদ্ধ হৃদয় উথলিয়া উঠিল,—জংলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল—"মুইডা জংলা—মুইডা কি করি জুমিয়া হইবু? জংলা মরুতে যাউছে—জংলা মরুবে,—জংলা তবু জুমিয়া হউতে নারুবে। জুমিয়া তুইডার শক্তি জংলার নাই, তুইডার তেজ জংলার নাই—তুইডার কিছুই জংলার নাই—তবে জংলা যে সে জুমিয়া হউবে কেমনে? যদি জংলা জুমিয়াই হউবে—তবে সে জংলা হইল কেন? বাবাডা তুই জংলাকে মরুতে পাঠাউছিস—সে মরুবে, তবু সে জুমিয়া হউতে নারুবে।"

জংলা তাহার দুঃখ ভার লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, আকাশের তারা আকাশে মিলাইয়া পড়িল, পূর্ব্ব গগন ঈষৎ আলোকিত হইয়া ক্রমে নানা বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল, পথিক দু-একজন জংলার পাশ দিয়া চলিয়া গেল,

জংলা চারিদিক একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বনে প্রবেশ করিয়া একটি উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই একদল শিকারী তাহার নেত্রপথে পড়িল, জংলা ত্রস্তে গাছ হইতে নামিয়া গাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইল। শিকারীদল নিকটবর্ত্তী হইল, জংলা ঝোপের মধ্য হইতে রাজাকে দেখিতে পাইল, শরীরের সমস্ত শোণিত তাহার চনচন করিয়া উঠিল। ইহার জন্যই তাহাদের এত অস্বস্তি এত কষ্ট! কতদিন হইতে ইহার জন্যই তাহারা অপেক্ষা করিতেছে? জঙ্গুর প্রত্যেক উত্তেজনাবাক্য তাহার মনে পড়িতে লাগিল, একটা অস্বাভাবিক সাহসে হঠাৎ তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। শিকারীদল ঝোপের পাশ দিয়া কিছু দূরে যাইতে না যাইতে রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সে বাণ নিক্ষেপ করিল।

শিকারীদের মধ্যে সহসা একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল, চারিদিকে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, জংলা এদিকে বাণনিক্ষেপ করিয়াই গাছের ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে ছুটিয়া পলায়ন করিল। বনের মধ্যে এক স্থানে দুজন কাঠুরিয়া-ভীল কাঠ সংগ্রহ করিতেছিল, ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহাদের চোখের উপর আসিয়া পড়িল। হঠাৎ একজনকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছে কি ব্যাপার?" এই সময় দৈবক্রমে একটা

হরিণ সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল, জংলা ছুটিতে ছুটিতে সেই-দিকে আঙ্গুল দিয়া উত্তর করিল—"শীকার শীকার"।

তাহারা বুঝিল সে ঐ শীকার ধরিতে ছুটিয়াছে। তাহা-দেরও কৌতূহল হইল। হরিণ যে দিকে ছুটিয়াছিল তাহারাও কাঠ ফেলিয়া সেই দিকে ছুটিল। জংলা গতিক মন্দ দেখিয়া পথ বদলাইয়া একটা নিবিড় জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। কাঠুরিয়া দুইজন শীকারান্বষণে এদিক ওদিক খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল, তাহার পর রাজ-সৈনিক কর্ত্তৃক সহসা বন্দী হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তিন পাহাড়।

আজকাল খবর তারে চলে, কিন্তু যখন তারের বন্দবস্ত ছিল না তখন যে খবর চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিত তাহাও নহে, তখন খবর বাতাসে চলিত। রাজা যে শীকার করিতে গিয়া নিজে শীকার হইবার উদ্যোগে ছিলেন—এ কথা কাহারো জানিতে বাকী নাই, রাজ্যের সীমা হইতে সীমান্তরে একথা রাষ্ট্র হইয়াছে; কেবল রাষ্ট্র নহে, নানা স্থানে নানা রূপ অলঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া যাহা নহে তাহা পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছে। একে নূতন খবর তাহার পর আবার এত বড় একটা খবর, সহরে গ্রামে, মাঠে,

ঘাটে, দোকানে বাজারে, রন্ধনশালায়, শয়ন-গৃহে, যেখানে সেখানে এই কথা। ক্ষুদ্র তিন পাহাড় গ্রাম (তিন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম তিন পাহাড়) যেখানে পলাতক জুমিয়া সপরিবারে লুকাইয়া আছে, সেখানেও আজ প্রাতঃকালে এই কথার গুলজার চলিয়াছে, কৃষকেরা রাখালেরা গরু লইয়া মাঠে যাইতে যাইতে এই গল্প সুরু করিয়াছে।

একজন বলিতেছিল—"উঃ এমন ত কখনো শুনিনি? গুজব না ত?"

আর একজন কহিল—"গুজব! যখন মরা রাজাকে প্রহরীরা পুকুর থেকে বার করে তোলে তখন প্যারীলাল সেখানে দাঁড়িয়ে? কেমন প্যারীলাল?"

গরুর লেজের হাত লেজে রহিল, সকলে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্যারীলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্যারীলাল কোন কার্য্যোপলক্ষে সম্প্রতি ইদর গিয়াছিল সেই কাল রাত্রে এ সংবাদ বাড়ী আনিয়াছে। প্যারীলাল আজ মস্ত লোক, সে গাম্ভারীচালে দুই হাত বুকের মধ্যে আঁটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না আমি দাঁড়িয়ে দেখিনি, যে সেখানে দাড়িয়েছিল তার মুখেই আমি শুনেছি।"

"ঐ তাহলেই হোল!"

"যে মেরেছে সে ধরা পড়েছে?"

প্যারীলাল একটা হেঁয়ালির মত একটু মাথা নাড়িয়া

বলিল—"না—হ্যাঁ—এই ভীল কতকগুলা ধরা পড়েছে—কিন্তু বুঝলে কি না"—

কিন্তু কেহই কিছু বুঝিল না, কেবল বুঝিবার আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্যারীলাল বলিল—"অমন মারা কি মানুষের কর্ম্ম—"

"কে মারবে তবে?" চারিদিক হইতে এই উৎসুক প্রশ্ন উঠিল।

প্যারীলাল গূঢ় অর্থ-পূর্ণ কটাক্ষে ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদু-স্বরে বলিল—"সঙ্গীণ ব্যাপার—সমস্তই ভূতের কাণ্ড!" সকলে অবাক হইয়া রহিল, প্যারীলাল বলিল—"পাহাড়ের চূড়ার উপর তুলে সেখানে মুখ থুবড়ে নাকি মেরে ফেলেছে।"

একটা রহস্য ভেদ হইল, সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। একজন বলিল—"পাহাড়ের চূড়ায় তুলে মেরেছে—তবে পুকুরে না?

প্যারীলাল রাগিয়া উঠিল, বলিল—"আ খেলে যা, সেখানে আর কি পুকুর থাকতে নেই, এ রকম গাঁজাখুরে কথা বল্লে আমার দেখছি কথা বন্ধ করতে হয়।" এই কথায় কুতূহল শ্রোতৃবর্গ বড়ই ভীত হইলেন, সকলে এক বাক্যে উল্লিখিত মন্দ বক্তার নিন্দাবাদ করিয়া তাহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিলেন, ওরূপ আর একটি কথা কহিলে সে হতভাগার যে আর এখানে—এমন কি—আর

কোন খানে ঠাঁই নাই, দশ জনে মিলিয়া কেহ তাহাকে ইহা বুঝাইতে বাকী রাখিলেন না। এইরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত সহানুভূতি-সিঞ্চিত হইয়া প্যারীলাল যখন আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন তখন একজন আবার সাহস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তা মানুষে মারেনি,—ভূতে যে মেরেছে, এটা ত রাজা জেনেছে?

আর একজন বলিল—"তা সত্যি? নইলে বিনি-দোষে অন্যেরা মারা যাবে?'

যে ইতিপূর্ব্বে একবার কথা কহিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল, আবার সে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল "কিন্তু রাজা না মরেছেন?"

তাওত বটে! এবার কেহ রাগ করিল না, গম্ভীর ভাবে কেবল একটা ঘাড় নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল। যেন লাখ কথার এক কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। ত্যু এক জন বলিল—

"তাই ত, তবে বিচার করবে কে?"

আর একজন উত্তর করিলেন "রাজা না থাকলেই রাণী বিচার করে? তার জন্য আর ভাবনা কি?"

প্যারীলাল বলিল—"বিচার কি আর এখনো বাকী আছে, সে সব হয়ে গেছে।"

কি বিচার হইয়াছে জানিবার জন্য সকলে উৎসুক

হইয়া উঠিল—প্যারীলাল বলিল—"রাজ্যে যত ভীল আছে সবার মাথা নেবার হুকুম হয়েছে।"

সকলে অবাক হইয়া রহিল, একজন কেবল বলিল—"তবে এ যাত্রা বড়ই বেঁচে যাওয়া গেল! জুমিয়ার কাছে ও বছর আধ মন গম ধার নিয়েছিনু—এখন শুদে-আসলে তিন মন দাঁড়িয়েছে। বেটা দেখা হলেই সেই গম দাবী করে, এখন আমি তার মাথা দাবী করব—কেমন কি না? ঐ যে বেটা বলতে বলতে আসছে!"

প্যারীলাল ইদর হইতে ফিরিয়াছে শুনিয়া জুমিয়া বাড়ীর খবর জানিতে তাহার কাছেই আসিতেছিল। অন্য সময় জুমিয়ার সহিত দেখা হইলেই ঋণদার সরিতে চেষ্টা করিত, আজ সে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু জুমিয়া তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া প্যারীলালকে বলিল—"বাবাডার সঙ্গে দেখা হউল কি? যা বলিতে বলিনু বলুছিস?"

সে বলিল—"না তাহা পারি নাই—রাজধানীতে বড় গোলযোগ, এখন কি ভীলেদের সঙ্গে দেখা করার যো আছে, যে দেখা করে তাহার পর্য্যন্ত মাথা যায়।"

বিস্মিত জুমিয়ার কর্ণে ক্রমে সমস্তই উঠিল।—জুমিয়াকে ব্যথিত অবসন্ন দেখিয়া একজন কহিল "জুমিয়া ভাবিস নে, আমরা থাকিতে তোর মাথা লইতে কেহ পারিবে না। কেন তুই কি আমাদের মন্দ প্রতিবাসী?"

কিন্তু ঋণদার গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

"তবে কিন্তু আমার ধানের ভাগটা এইবেলা কমাইয়া দিক্"—

জুমিয়া কাহারো কথায় লক্ষ্য না করিয়া বলিল "সবার মাথা যায়, মুইডারো যাইবে,—মুইডা আজই ইদর যাইব্" —

ঋণদার বলিল—"গমগুলা ?"

জুমিয়া বলিল—"ছাড়ি দিউছি, তোর দিতে হউবে না।" ঋণদারের তখন আবার আর এক ভাবনা পড়িয়া গেল, বলিল—"না তাহা হইবে না। তোর ঋণ লইয়া আমি মরিব বুঝি ? এক সের গম আমি তোকে আনিয়া দিই,—তুই তাহা লইয়া আমাকে রেহাই দে।"

ঋণদার মাঠ হইতে বিকালে বাড়ী গিয়াই আগে এক-সের গম জুমিয়ার বাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিল, কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল জুমিয়া বাড়ী নাই, তখন পরজন্মের ঋণের ভারে নিতান্ত ভারগ্রস্ত হইয়াও ইহজন্মের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

জুমিয়া ১৫ দিনের মধ্যেই বাড়ী পৌছিল।

—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

জুমিয়া যাহা শুনিয়াছে, তাহা ঠিক নহে, বাণাঘাতে নাগাদিত্যের মৃত্যু হওয়া দূরে থাক, তিনি অক্ষত বাঁচিয়া গিয়াছেন, বাণ তাঁহার কেশ গাছি পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া কেবল উষ্ণীষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জঙ্গ সেই দিন হইতে শয্যাগত। সেই দিন হইতে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। সেই দিন যখন জঙ্গ জানিতে পারিলেন জংলা অকৃতকার্য্য হইয়াছে—কেবল তাহাই নহে, তাহার উপর আর একটা অনর্থ ঘটিয়াছে, দুই জন ভীল বন্দী হইয়াছে,—তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই যে জঙ্গ সংজ্ঞাহীন হইয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন তাহার পর ১৫ দিন ধরিয়া তাঁহার আর সম্যক জ্ঞান লাভ হইল না। যদিও পরে অল্পে অল্পে জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে কিন্তু বাঁচিবার আর আশা নাই। ভগ্ন হৃদয়, নিরাশ প্রাণ, অবশ শরীর লইয়া তিনি এখন যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার কেবল জুমিয়াকে মনে পড়িতেছে, এতদিন যে উদ্দেশ্য, যে আশা হৃদয়ে ধরিয়া তিনি আর সব ভুলিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সে আশা হারাইয়া জুমিয়ার জন্য তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বুঝি তাঁহার এই আকুলস্মৃতির গভীরতম প্রদেশে তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটা আশার ক্ষীণরেখা

এখনো বহিতে থাকে, তাঁহার এই শেষসময়ের শেষকথা জুমিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না, বুঝি বা এইরূপ একটা লুক্কায়িত বিশ্বাসে জুমিয়ার জন্য তাঁহাকে অধিক পাগল করিয়া তোলে!

ভোর হইয়াছে। পরিষ্কার বসন্তের প্রভাত। জঙ্গুর রুদ্ধ দ্বার গৃহে প্রভাতের এ নির্ম্মলতা পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, দেয়ালের উঁচু দুইটি ছোট জানালার গহ্বর দিয়া জঙ্গুর বিছানার উপর খানিকটা সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে, তাহার আলোকে সমস্ত ঘরখানি অল্প অল্প উজ্জ্বল হইয়াছে। অনেকক্ষণ হইতে জঙ্গু জাগিয়া আছেন, বিছানায় শুইয়া তাঁহার কত কি মনে পড়িতেছে। সেও এমনি একটি সকালবেলা, এইরূপ আধো আলোক আধো অন্ধকারে বসিয়া জুমিয়ার সহিত শেষ কথা কহিয়াছিলেন। আর সকলি তেমনি আছে, দেয়ালের সেই ধনুর্ব্বাণ তেমনি রহিয়াছে, কেবল সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর আসে নাই। জুমিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, বাতাসে বন্ধ-দ্বার অল্প অল্প নড়িতেছিল, জুমিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার আগে আস্তে আস্তে এইরূপে সে দ্বার নড়াইত। আজ কাল বাতাসে যখন দ্বার এইরূপ নড়ে, তাঁহার মনে হয় জুমিয়া আসিতেছে। এক এক বার ইহা এত সত্য বলিয়া মনে হয় তিনি জুমিয়া জুমিয়া করিয়া ডাকিয়া উঠেন, কিন্তু দ্বার যেমন বন্ধ তেমনি থাকে, আজও কি মনে

হইল হঠাৎ একবার জুমিয়া জুমিয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, বাহির হইতে শিকলি বন্ধ ছিল হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, আজ সত্যই জুমিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—জঙ্গুর অসাড় হৃদয়েও রক্ততরঙ্গ উথলিয়া উঠিল—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, জুমিয়া কাঁদিয়া পিতার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে যখন জল প্লাবিত চক্ষু জঙ্গু উন্মীলিত করিলেন—দেখিলেন দুই জন স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পুত্রবধূকে চিনিতে পারিলেন—কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বালিকা এখন এত বড় হই-য়াছে যে তাহাকে সহজে আর চেনা যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল, উথলিত অশ্রু শুকাইয়া পড়িল, তাঁহার সম্মুখে একটি দেবী মূর্ত্তি দণ্ডায়-মান দেখিলেন—তাহার লাবণ্য জ্যোতিতে তাঁহার অন্ধ-কার হৃদয় হঠাৎ যেন পূরিয়া গেল, নিরাশ হৃদয় যেন আশা পূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি বলিলেন "সুহার এত বড় হউছে! বাছাডা কাছে আয়"।

সুহার তাহার নিকটে বসিল। জুমিয়ার পানে চাহিয়া এতদিন তাহার যে তৃপ্তি হইত বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার সেইরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ হইল, তাহার নয়নে সেইরূপ আশা দেখিতে পাইলেন—তিনি অতৃপ্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

যে দুই জন নিরপরাধ ভীল অপরাধী রূপে ধৃত হইয়াছে—মাসাবধি পরে আজ তাহাদের বিচার। এ দুই জন ছাড়া ইহার মধ্যে যদি আরো কেহ থাকে—সেই সন্ধান জন্য এত দিন বিচার বন্ধ ছিল কিন্তু আর কাহারো সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিচারাসনে রাজা, তাঁহার দুই পার্শ্বে সভাসদগণ, সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীল দুইজন দণ্ডায়মান।

আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কাহারো মুখে কথাটি নাই, কুতূহল দর্শক বৃন্দ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। রাজা এখনো একটি কথা কহেন নাই, মন্ত্রী অপরাধীদিগকে যাহা বলিতেছেন রাজা স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে অপরাধীদিগের দিকে চাহিয়া তাহা শুনিতেছেন। রাজার দৃষ্টিতে ক্রোধ কিছুমাত্র নাই, একটা বিষণ্ণ করুণ ভাবে তাহার মুখকান্তি সুগম্ভীর, ভীলদিগকে দেখিয়া রাজার তাহাদিগকে দোষী বলিয়া মনে হইতেছে না, তাহাদিগকে তিনি যতই দেখিতেছেন, তাঁহার জুমিয়াকে মনে পড়িতেছে। তাহার সেই বলিষ্ঠ মূর্ত্তি, সরল ভাব, অসম সাহস, রাজার প্রতি পরিপ্লুত প্রেমভক্তি সব মনে পড়িয়া

যাইতেছে, আর তাঁহার নিজের সেই প্রীতিবিভাসিত হৃদয়ালোকে জুমিয়ার সমজাতি সমশ্রী-অপরাধীগণের মলিন মুখশ্রী পর্য্যন্ত তিনি নির্দ্দোষ-বিমল দেখিতেছেন। তিনি যতই দেখিতেছেন যতই ভাবিতেছেন কিছুতেই তাহাদের অপরাধী বলিয়া মনে হইতেছে না, কেনই বা অকারণে তাহারা রাজহত্যা করিতে যাইবে, তিনি তাহাদের কি করিয়াছেন? পাগল না হইলে বিনা কারণে এরূপ কাজ কেহ করে! তাঁহার পিতামহকে একজন ভীল মারিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। রাজার মুখ-কান্তি ক্রমশই অধিকতর অন্ধকার হইতে লাগিল, মন্ত্রী যখন অপরাধীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন রাজা একাগ্র-মনে বলিতে লাগিলেন—'ভগবান! সংশয় হইতে আমাকে দূরে রাখ, যখন ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার দিয়া তোমার প্রতিনিধি করিয়া সংসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ—তখন তোমার ন্যায়-জ্যোতি দিয়া আমার অন্ধ নয়ন ফুটাইয়া দাও, আমি দোষী নির্দ্দোষীকে যেন এক করিয়া না ফেলি, তোমার সত্য করুণা দিয়া আমি যেন বিচার করিতে সমর্থ হই।"

মন্ত্রী যখন বিচার একরূপ শেষ করিয়া মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখিতেছেন ত? ইহারা যে অপরাধী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, প্রাণদণ্ডই একমাত্র ইহাদের দণ্ড, এখন মহারাজের অনুমতির মাত্র অপেক্ষা"—

পুরোহিত গণপতি যখন তাহাতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রাণদণ্ডই ইহাদের একমাত্র দণ্ড"—বিদূষক যখন তাহার স্বাভাবিক হাস্যভাব গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে,—প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ড"—মহারাজ তখন মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—

"আগে প্রমাণ তবে দণ্ডাজ্ঞা, আগেই দণ্ডাজ্ঞা দিতে আমার অধিকার কি ?"

মন্ত্রী একটু বিস্মিত হইলেন—বলিলেন—"মহারাজ প্রমাণের কি কিছু অভাব দেখিলেন ?

রাজা গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"সম্পূর্ণই। উহাদের কি আমার প্রতি তীর ছুঁড়িতে কেহ দেখিয়াছে ?

মন্ত্রী। "না দেখুক, সকল সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়া যদি প্রমাণ স্থির করিতে হয়—তবে বিচার একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। যতদূর সম্ভব তাহাতে উহাদের দোষ সন্দেহ নাই ?"

রাজা বলিলেন—"যতদূর সম্ভব ! সম্ভব অসম্ভব আমরা কি বুঝি ? পৃথিবীতে সবই অসম্ভব, সবই সম্ভব,"

গণপতি বলিলেন "সে কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক"

মন্ত্রী বলিলেন—"তা সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বুঝি তাহা লইয়াই ত আমাদের কাজ করিতে হইবে, যতদূর

বোঝা গেল তাহাতে উহাদের প্রতি ত আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে।”

রাজা বলিলেন—“সন্দেহ হইতেছে? কিন্তু সন্দেহ ত আর প্রমাণ নহে”—

মন্ত্রী বলিলেন, “সন্দেহ প্রমাণ না হউক, প্রমাণ হইতেই এ সন্দেহ!”

রাজার মুখ জ্বলিয়া উঠিল, রাজার প্রথমে যে টলমল ভাবটুক ছিল সভাসদদিগের প্রতিকূল বাক্যে সেটুকও রহিল না, বলিলেন—“না ইহা প্রমাণ নহে, ইহা যথেচ্ছাচার।”

গণপতি আস্তে আস্তে বলিলেন “চমৎকার কথা!”

মন্ত্রী ঘাড় হেঁট করিলেন, বুঝিলেন আজ তিনি ঠিক রাজার মেজাজটা বুঝিয়া চলিতে পারেন নাই, আর যে প্রমাণের উপর বিচারের নিষ্পত্তি নির্ভর করিতেছে না তাহা বুঝিলেন, বুঝিলেন, এ বিচারের গতি এখন কোন দিকে, আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

রাজা ও সভাসদদিগের এই গুপ্ত পরামর্শের ফল জানিতে সকলে অধীর হইয়া উঠিল, রাজমুখ হইতে মৃত্যুদণ্ড শুনিবার অপেক্ষায় অপরাধীদিগের হৃৎপিণ্ডে প্রতিক্ষণে রক্তের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে লাগিল, রাজা অপরাধীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“তোমরা সে দিন আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে?”

তাহারা অবিচলিত কণ্ঠে বলিল "না"

রাজার মুখে একটা জয়ের ভাব প্রকাশ পাইল, এখন যদি কোন ক্রমে তাহাদের দোষ প্রমাণ হয় ত সেটা যেন তাঁহারি লজ্জার কথা! তাহাতে যেন তাঁহারি পরাজয়! মহারাজ তীব্র কটাক্ষে মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন—যেন এতটা সমস্ত মন্ত্রীরই দোষ। মন্ত্রী একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"উহারা যদি দোষী না হইবে, তবে প্রহরীদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল কেন?"

রাজা তীব্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ওসব কথা ত আগেই হইয়া গেছে, উহারা পলায়ন করে নাই—শীকার দেখিয়া ছুটিয়াছিল।

মন্ত্রী। "অথচ বলিতেছে তীর ছুঁড়ে নাই? শীকার করিতে গিয়া তীর ছুঁড়িবে না—কোন কথাটা ঠিক!"

রাজা বলিলেন—"সবটাই ঠিক! তীর না ছুঁড়িয়াও শীকার করা যায়।

মন্ত্রী। "তবে তীর কোথা হইতে আসিল?"

মন্ত্রী কয়েদীদিগকে সম্বোধন করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা যদি তীর ছুঁড়িলে না, তবে কে ছুঁড়িয়াছিল।"

উত্তর। তাহা জানি না। একজনকে কেবল আমরা ছুটিতে দেখিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। "তোমরা একজনকে ছুটিতে দেখিলে—আর

সৈনিকেরা দেখিল না!" অপরাধীগণ ভড়কিয়া গেল, কোন উত্তর করিল না।

রাজা বলিলেন—"তাহা উহাদের অপরাধ নহে।"

মন্ত্রী। রাজদ্রোহীকে ছুটিয়া যাইতে দেখিলে—তবে ধরিবার চেষ্টা করিলে না কেন?

উত্তর। "আমরা মনে করিয়াছিলাম—সে হরিণ শীকারে ছুটিতেছে সেই সময় একটা হরিণকে ছুটিয়া যাইতে দেখি, তাহা ছাড়া আমরা কিছু জানিতাম না।"

রাজা বলিলেন—"বাস্তবিক তাহারো কোন অপরাধ না থাকিতে পারে, পশুবধ করিতে দৈবাৎ আমার দিকে তাহার বাণ আসিয়া পড়িয়াছিল?"

মন্ত্রী বলিলেন "যদি তোমরা নির্দ্দোষ তবে রাজার প্রহরীদিগের নিকট আত্ম-সমর্পণ না করিয়া তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছিলে কেন?"

উত্তর হইল "ধর্ম্মাবতার আমরা নির্দ্দোষী, বিনা দোষে প্রহরীরা কেন আমাদের বন্দী করিবে।"

কয়েদীরা এতটা আশ্বস্ত হইয়াছিল যে অসঙ্কোচে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া দিল। মন্ত্রী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু রাজার ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

রাজা বলিলেন—"কিন্তু সাবধান, এমন কাজ আর করিও না, রাজপ্রহরীর আর কখনো অসম্মান করিলে গুরু-

দণ্ড পাইবে। ঐ অপরাধে তোমাদের এক মাস কারাবাস, তাহার পর মুক্তি। যাও, প্রহরী উহাদের লইয়া যাও।”

দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া লোকেরা ‘থ’ হইয়া গেল, কয়েদীদের আহ্লাদে মূর্চ্ছা যাইতে কেবল বাকী রহিল, সভাসদদিগের মুখে কোন বাক্য সরিল না। পুরোহিত হরিতাচার্য্য সম্প্রতি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি নিস্তব্ধে এতক্ষণ বিচারের শেষ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—রাজার এই অসাধারণ ক্ষমাশীলতায়—এই পুণ্যময় বিচারে, উৎফুল্ল হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ বিচারালয়ের দ্বার দেশ হইতে একটা জয়ধ্বনি উঠিল। একজন ভীল, দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া উন্মত্ত আহ্লাদে “জয় হউক,জয় হউক”, বলিতে বলিতে রাজসিংহাসনের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল, রাজা আহ্লাদে বিস্ময়ে মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া শত সহস্র বিস্মিত দর্শকের নেত্রের উপরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নবাগত ভীল আর কেহ নহে জুমিয়া। রাজার এই ব্যবহারে হরিতাচার্য্যও বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখের আশীর্ব্বাদ মুখেই মিলাইয়া গেল, তিনি স্তম্ভিত ভাবে জুমিয়াকে দেখিতে লাগিলেন।

যখন সভা ভঙ্গ হইল, দর্শকগণ চলিয়া গেল, জুমিয়া

চলিয়া গেল—রাজা অন্তঃপুরে যাইবার জন্য উঠিলেন—তখন হরিতাচার্য্য নিকটে আসিয়া বলিলেন, ‘মহারাজ, আর একটু বসিতে আজ্ঞা হউক, একটি কথা আছে”।

রাজা বসিলেন, মন্ত্রী বিদূষক গণপতিও বসিলেন, হরিতাচার্য্যও আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “মহারাজ ভীলের সহিত এরূপ বন্ধুতা কি রাজোচিত কার্য্য ?”

মহারাজ সহসা ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—“কেন তাহাতে ক্ষতি কি ? মহারাজ গুহা ত ইহা রাজানুচিত কার্য্য মনে করেন নাই”—

পুরোহিত বলিলেন, “কিন্তু আশাদিত্য ভীল কর্ত্তৃক নিহত হইতে গিয়াছিলেন মনে আছে কি ?”

নাগাদিত্য বলিলেন,“ঐ ভয়ে যদি জুমিয়ার সহিত বন্ধুতা অনুচিত জ্ঞান করেন তাহা হইলে আমি নির্ভীক আছি”—পুরোহিতের মুখ গম্ভীর হইল—রাজা হাসিয়া বলিলেন—

“আপনার মুখ দেখিলে কেহ মনে করিবে আপনি যেন মৃত্যুর সম্মুখে” ।

পুরোহিত বলিলেন “মহারাজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইতে আমার ভয় নাই—আপনার কোন অমঙ্গল না ঘটে ইহাই আমার ভাবনা।”

রাজা বলিলেন—“আমার যে অমঙ্গল না ঘটিতে পারে তাহা আমি বলিতে পারি না—কিন্তু জুমিয়া হইতে কখনই ঘটিবে না”—

পুরোহিত বলিলেন—"কিন্তু এই বন্ধুতায় প্রজারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে ?"

রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন, "আমি কাহাকে বন্ধু ভাবি বা না ভাবি ইহা আমার হৃদয়ের ব্যাপার, রাজা বলিয়া আমার হৃদয়ের স্বাধীনতা আমি প্রজার নিকট বিক্রয় করি নাই !"

পুরোহিত বলিলেন, "রাজা হইলে তাহাও করিতে হয় বই কি ? রামচন্দ্র কি করিয়াছিলেন ?"

কথাটা রাজার ভাল লাগিল না—কিন্তু সহসা কি উত্তর দিবেন—ভাবিয়া পাইলেন না, কিছু পরে বলিলেন, "কিন্তু প্রজারা যখন অসন্তুষ্ট হইবে তখন সে কথা। এখন পর্য্যন্ত ত তাহা হয় নাই।"

পুরোহিত বলিলেন—"আমার বিশ্বাস বিপরীত।"

রাজা বলিলেন—"আপনার বিশ্বাস যাহাই হোক—কিন্তু আর কেহ ওরূপ বলিবে না,—গণপতি ঠাকুর আপনার কি মনে হয় ?"

গণপতি বিপদে পড়িলেন, রাজা কি উত্তর প্রত্যাশা করেন তাহা বুঝিলেন, তাহার বিপরীত বলিতে সাহস হইল না—একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"প্রজারা—কই—অসন্তুষ্ট ত দেখিতেছি না—"

পুরোহিত বলিলেন—"কিন্তু এই বন্ধুতায় তোমরা কি

অসন্তুষ্ট নও? রাজার এরূপ ব্যবহার কি উচিত বিবেচনা করিতেছ?"

মন্ত্রী রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার ক্রুদ্ধ কটাক্ষ তাঁহার নজরে পড়িল—বিচারের সময় তিনি রাজার মতের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন—তাঁহার ইচ্ছা এখন রাজার মনের মত কথা বলেন, তিনি বলিলেন—"রাজা যাহা করেন তাহাই উচিত।"

পুরোহিত বলিলেন "অন্যায় করিলেও?"

রাজা বলিলেন—"কিন্তু জুমিরাকে ভালবাসা একটা অন্যায় কাজ নহে।

পুরোহিত দেখিলেন তাঁহার মনে যা আছে তাহা যত-ক্ষণ বলিতে না পারেন—ততক্ষণ রাজা কিছুই বুঝিবেন না—অথচ তাহা খুলিয়া বলিবারও যো নাই—তিনি আর একরূপ করিয়া বুঝাইবার ইচ্ছায় বলিলেন "অনেক সময় একটা কাজ আসলে অন্যায় না হইয়াও অন্যায়, যদি—"

রাজার আর ধৈর্য্য রহিল না—এরূপ করিয়া তাঁহার কথার উপর কথা শোনা তাঁহার অভ্যাস নাই—তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কাজটা আসলে অন্যায় না হই-লেই হইল—আমি আর কিছু চাহি-না।" ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই—রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হরিতাচার্য্য।

কমলাবতীর পুত্র ছিল না, সুতরাং তাঁহার কন্যা সত্যবতীর বংশই একলিঙ্গদেবের মন্দিরের অধিকারী। কিন্তু জ্যেষ্ঠানুক্রমে এ অধিকার প্রাপ্তির নিয়ম নাই। যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম তিনিই এই মন্দিরের পুরোহিত। এই সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতই ইদররাজদিগের কুলাচার্য্য বলিয়া গণ্য এবং ইহাঁদের গণনা ও পরামর্শ দ্বারাই রাজাগণ চালিত হইয়া থাকেন।

মৃত পুরোহিত দেবাচার্য্যের দুইটি ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিলেন—হরিতাচার্য্য কনিষ্ঠ। নাগাদিত্য শিশুকালে পিতৃ মাতৃহীন হইলে তাঁহার লালন পালনের ভার যখন তাঁহার খুল্লতাত বুধাদিত্যের হস্তে আসে—তাহারি অব্যবহিত পরে দেবাচার্য্যের মৃত্যু হয় এবং ষোড়শ বর্ষের বালক হরিদাচার্য্যের হস্তে উক্ত মন্দিরের পৌরহিত্য ভার আসিয়া পড়ে।

বালক হইলেও হরিতাচার্য্যের-পাণ্ডিত্য যশে ইদর পূর্ণ হইয়াছিল, ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার বংশের শিক্ষণীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতেও দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং বালক বলিয়া ইহাঁর মান্যের অভাব ছিল না। রাজ্য ভার হস্তে পাইয়াই বুধাদিত্য হরিদাচার্য্যকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। আশাপুরে রাজনিবাস হইলেও ইহাঁরা ইদরের মন্দিরেই বাস করিতেন, আবশ্যক হইলে রাজ-আহ্বানে মাত্র এখানে আগমন কবিতেন।

এখন তাঁহাকে ডাকিবার উদ্দেশ্য নাগাদিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করা। পণ্ডিত আসিলে একটি নির্দ্ধারিত শুভদিনে হরিতাচার্য্যকে একটি নির্জ্জন কক্ষে ডাকিয়া বুধাদিত্য তাঁহার হস্তে নাগাদিত্যের জন্ম-কোষ্ঠি দিলেন, জন্ম-কোষ্ঠি দেবাচার্য্যের দ্বারা গণিত। আচার্য্য কোষ্ঠি চক্র গণনা করিতে লাগিলেন—সহসা তাঁহার গৌরমুখ পাণ্ডু-বর্ণ হইয়া গেল,—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিতেছেন ?"

তিনি মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"যৌবনে মৃত্যুভয় ! অস্ত্রাঘাত, অস্ত্রাঘাত !"

রাজা বলিলেন—"সেই জন্যই আপনাকে ডাকিয়াছি। গুরুদেব দেবাচার্য্য এই গ্রহ খণ্ডনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইয়াছে—এখন ইহার প্রতিকার আপনার হাতে"—

আচার্য্যের মুখ অন্ধকার হইল, প্রতিকার কি তাঁহার সাধ্য ! তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান যে ইহার পক্ষে নিতান্ত সামান্য !

বলিলেন "আমি সামান্য মানুষ হইয়া বিধাতার লিপি খণ্ডনে কি সমর্থ হইব !"

রাজা বলিলেন—"আপনি দেব পুরোহিত—দেব লিপি খণ্ডন আপনার সাধ্য না হউক—তাঁহাকে প্রসন্ন করা আপনার সাধ্য;—আপনি তাঁহাকে প্রসন্ন করুন তিনি আপনার লিপি আপনি খণ্ডন করিবেন।"

হরিতাচার্য্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—রাজা বলিলেন "এ গ্রহ খণ্ডন যদি সাধ্যাতীত হইত—তবে আপনার জ্যেষ্ঠ-তাত তাহার ভার লইতেন না,—অবশ্য ইহা সিদ্ধনীয়।"

হরিতাচার্য্য ভাবিলেন—তাহা সত্য,—বলিলেন—"তাহাই হউক—চেষ্টার ক্রটি হইবে না, পরে যাহা হয় আপনি জানিতে পারিবেন—"

আচার্য্য কোষ্ঠি সঙ্গে লইয়া বাস গৃহে গেলেন, পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন—দেখিলেন ২০ হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত নাগাদিত্যের বিপদের কাল। ২২ বৎ-সর—চৈত্র সংক্রান্তি! অতি ভয়ানক! সাংঘাতিক! অস্ত্রা-ঘাত! কোথা হইতে অস্ত্র আসিতেছে,স্পষ্ট ধরিতে পারিলেন না। স্ত্রী পুরুষ উভয় হইতেই এ মৃত্যুভয় এই পর্য্যন্ত বুঝি-লেন, ভাবিলেন—তবে কি বিদ্রোহ? গণনা করিলেন—দেখিলেন—দূরে চিত্রের পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা-অন্ধকার—কিন্তু রাজার সম্মুখে দুই একটি মনুষ্য! বুঝিলেন বিদ্রোহ হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে রাজার সাক্ষাৎসম্বন্ধে অমঙ্গলের কারণ নাই। রাজার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ দুই একজন স্ত্রী পুরুষ। ইহার পর আর সব অন্ধকার,

আর কিছু ভাবিতে পারিলেন না। যদি কারণ সম্যক না জানিলেন—তবে প্রতিকার কিরূপে করিবেন! দেখিলেন—এখনো জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাঁহার কিছুই শেখা হয় নাই—নিজ বিদ্যার প্রভাবেই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাত বলিতে পারিয়াছিলেন—গ্রহ খণ্ডিত হইবে, তাঁহার তেমন বিদ্যা কই? তাঁহার অকালে শিক্ষা ভগ্ন হইয়াছে, গুরুর বিদ্যা আয়ত্ত না করিতে গুরু মরিয়াছেন। হরিতাচার্য্য পীড়িত হইলেন, দেখিলেন তাঁহার উপর লোকের বিশ্বাস কি অসীম, কিন্তু যথার্থ পক্ষে তাহার ক্ষমতা কত অল্প! তাঁহার উপর রাজা, বাজা—নিজের মঙ্গলামঙ্গল রাখিয়া দিয়াছে, তাঁহার দায়িত্ব কতদূর! হরিতাচার্য্য সেই বিশ্বাসের যোগ্য হইতে সঙ্কল্প করিলেন, রাজপুত্রের জীবন বুধাদিত্য তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন—তাঁহার জীবন রক্ষা যাহাতে করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইদরে গিয়া তাহার জন্য প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং নিজে রীতিমত আবার জ্যোতিব্বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে দুই চার বৎসর গেল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মিল না। তিনি চান—রাজ জীবনের সমস্ত ঘটনা এবং তাহার কারণ ছবির মত তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিবেন—কিন্তু তাহা দেখিতে পান না, এখনো সমস্ত ধূঁয়া ধূঁয়া ছায়া ছায়া, আগেকার অপেক্ষা সেই ছায়ার মাত্রা গাঢ় এই মাত্র

উন্নতি। দেখিলেন গুরুর কৃপা ভিন্ন নিজে শিখিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। দক্ষিণের একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছিলেন—সেইখানে গমন করিলেন। যাইবার সময় বুধাদিত্যকে বলিয়া গেলেন বালকের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই তিনি যাইতেছেন, হয়ত কৃতকার্য্য হইয়াই ফিরিবেন। ৮ বৎসরের বালক নাগাদিত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

হরিতাচার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বল্লভাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার কাছে কি শিখিবে?"—

"জ্যোতির্ব্বিদ্যা"

"জ্যোতির্ব্বিদ্যা তুমি যথেষ্টই জান"

"তাহাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই"

"তাহা হইলে যোগাভ্যাস কর, জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি তোমার যাহা হইবার হইয়াছে; যোগ নহিলে জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্ঞান পূর্ণ হয় না।"

"যোগে কতদিনে সিদ্ধি লাভ হইবে।"

বল্লভ পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন—"সিদ্ধির কি সীমা আছে? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত জ্ঞানশক্তির সহিত আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানকে এক করাই যোগ, অনন্ত কালে ইহার সিদ্ধি। যোগে তোমাকে এক উন্নতি হইতে আর

এক উন্নতিতে, একসিদ্ধি হইতে আর একসিদ্ধির পথে অগ্রসর করিবে মাত্র। তবে ইহা বলা যায় যে, যে জ্ঞান তুমি পাইতে ব্যগ্র, ৫ বৎসর যোগাভ্যাস করিলে—তাহা পাইতে পারিবে, আধ্যাত্মিক ভাব তোমাতে প্রচুর বিদ্যমান দেখিতেছি।"

বাল্যকাল হইতে হরিতাচার্য্য সত্যানুরাগী, আত্মজ্ঞানপিপাসিত, অকালে গুরুহীন হইয়া তাঁহার সে পিপাসা মিটে নাই, নিজে রাজগুরু হইয়া গুরুর কর্ত্তব্য অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার আর সব আকাঙ্ক্ষা এত দিন নিবৃত্ত রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার কর্ত্তব্য এবং অনুরাগ এখন একই পথে শুনিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন—বলিলেন "তবে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, আমি যোগ শিক্ষা করিব"।

বল্লভ বলিলেন—"আমি তোমার উপযুক্ত গুরু নহি—তুমি যদি যোগ শিক্ষা করিতে চাও ত আমার গুরুর নিকট গমন কর, তিনি গোকর্ণে বাস করেন, কিন্তু এখন তাঁহার দেখা পাইতে হইলে হরিদ্বার যাইতে হইবে—সেখানে তীর্থ গমন করিয়াছেন।"

সেই দিনই হরিতাচার্য্য হরিদ্বার যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বল্লভ বলিলেন—'কিন্তু একটি কথা—তুমি যে জ্ঞান পাইতে ব্যস্ত যোগ দ্বারা সে জ্ঞান পাইলে তখন তোমার তাহা কাজে লাগিবে কি না সন্দেহ। সকল অব-

স্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সমান থাকে না, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কর্ত্তব্য জ্ঞানও ভিন্নরূপ হইয়া যায়। দেখ অসভ্য-দিগের কর্ত্তব্য আত্মপরিবারের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অবস্থিত—মানুষ যত জ্ঞান বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া সভ্য নাম লাভ করে ততই প্রতিবাসী হইতে—ক্রমে মনুষ্য সমাজে তাহাদের কর্ত্তব্য স্থাপিত হয়। সেইরূপ রাজার গ্রহ খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে জীবন দানই এখন তুমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছ—কিন্তু যখন তুমি যোগদ্বারা বিশ্বের মঙ্গলে সর্ব্ব মঙ্গল জ্ঞান করিবে—তখন যদি দেখিতে পাও রাজার প্রাণ রক্ষায় বিশ্বের নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে, বিশ্বের যে শক্তিতে রাজার প্রাণ নষ্ট হইতেছে—তাহার উপর হস্ত নিক্ষেপ করিলে বিশ্বরাজ্যের অমঙ্গল সাধিত হইবে—তখন তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে বিশ্বের নিয়তির পথে দণ্ডায়মান হইতে নিষেধ করিবে, তোমার ইচ্ছা তোমার জ্ঞান কেবল অনন্ত ইচ্ছা অনন্ত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া চালিত হইতে চাহিবে। ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্মফলের প্রতি তুমি উদাসীন হইয়া পড়িবে।”

হরিতাচার্য্য স্তম্ভিত হইলেন—যেন কাহার প্রতিধ্বনির মত বলিলেন “কাজে লাগিবে না!”

বল্লভাচার্য্য বলিলেন—“সম্ভবতঃ না। কই এত ত সিদ্ধ পুরুষ আছেন—ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্মে ত তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন না,—তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে

পারেন—কিন্তু তাঁহারা যে উদাসীন অবশ্য ইহার নিগূঢ় কারণ আছে।”

হরিতাচার্য্য খানিকক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তাহার পর বলিলেন “না দেব তবে আমি যোগাভ্যাস করিব না। আমি কেবল জানিতে চাই—নাগাদিত্যের নিয়তি লঙ্ঘনের কোন উপায় আছে কি না,—তাহা কি কেহ বলিয়া দিবেন না!”

বল্লভ বলিলেন—“যাহারা জানিতে পারেন—তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। যদি গুরু ইচ্ছা করেন তিনিই বলিতে পারেন ইহার কি উপায় আছে, আমার সে ক্ষমতা নাই।”

হরিতাচার্য্য তাঁহার উদ্দেশে হরিদ্বার গমন করিলেন, সেখানে গিয়া শুনিলেন—অল্পদিন হইল তিনি দ্বারকায় গিয়াছেন, হরিতাচার্য্য দ্বারকা যাত্রা করিলেন, সেখানেও তাঁহার দেখা পাইলেন না, শুনিলেন তিনি সেতুবন্ধ দর্শনে গিয়াছেন। এইরূপে হরিতাচার্য্য তাঁহার অন্বেষণে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল তবু তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তাঁহার দর্শন লাভে নিরাশ হইয়া আর একবার বল্লভ পণ্ডিতের নিকট গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবেন স্থির করিলেন। যদি দেখার কোন উপায় পান ত ভালই—নহিলে সেখান হইতে দেশে ফিরিবেন—এই ভাবিলেন।

পথে কত যোগী সন্ন্যাসীর সহিত সহযাত্রী হইয়া বেড়া-

ইলেন কেহই তাঁহার প্রশ্ন মীমাংসায় সক্ষম হইল না—সকলেই বলে অদৃষ্ট লঙ্ঘন করা কাহারো সাধ্য নহে।

পথে নাসিক আসিয়া পড়িল,—নাসিকে তখন পঞ্চবটীর মেলা,—একদিন মেলা শেষ হইলে তিনি গোদাবরী নদীতে সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া নদী তীরের একটি নির্জ্জন স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন—তিনি যেখানেই থাকুন নিয়মিত স্বস্ত্যয়ন করিতে ভুলিতেন না,—এই সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে স্বস্ত্যয়ন শেষ হইল, অগ্নি নিভিয়া গেল—অগ্নি নিভিয়া লাল অঙ্গারাবশিষ্ট মাত্র রহিল—সন্ন্যাসীর প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সন্ন্যাসী তখন তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন, তিনিও মেলা দর্শনে আসিয়াছেন—আগেই হরিতাচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে,—নানা কথার মাঝখানে তিনি বলিলেন "বৎস তুমি প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ন কর কি জন্য ?

হরিতাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, প্রতিদিন যে তিনি স্বস্ত্যয়ন করেন—তাহা সন্ন্যাসী কিরূপে জানিলেন ?

বলিলেন—"আপনি কি করিয়া তাহা জানিলেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছ দেখিলাম—তাহা হইতে মনে হইল—প্রতিদিনই স্বস্ত্যয়ন কর, ইহার আর কোন গূঢ় কারণ নাই।"

তথাপি হরিদাচার্য্যের মন ভক্তিপূর্ণ হইল—তিনি

বলিলেন—"ইদর-রাজ নাগাদিত্যের মঙ্গল কামনায় আমি প্রতি দিন স্বস্ত্যয়ন করিয়া আসিতেছি—দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গ্রহ খণ্ডন করুন এই আমার প্রার্থনা।"

তিনি বলিলেন—"বৎস তুমি কর্ম্মফল মান ?"

হরিতাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন—"হিন্দু হইয়া কর্ম্মফল মানিব না !"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমাদের নিয়তি কি কর্ম্মফল ছাড়া আর কিছু ?"

হরি। "কিন্তু কর্ম্মফল যিনি দিয়াছেন ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন,—বিচারক ইচ্ছা করিলে শাস্তি বন্ধ করিতে পারেন না কি ?

স। "পারেন, কিন্তু ন্যায্যরূপে পারেন না। হয় তাঁহার পক্ষপাতিতা করিতে হয়—না হয় নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। মানুষ যে অসম্পূর্ণ আত্মা—তাহার ন্যায়ও অসম্পূর্ণ, সেই বিশ্বব্যাপী ন্যায়ের তুলনায় ইহা ধূলি খেলা মাত্র, এখানে কত অন্যায় অবিচার নির্ব্বিবাদে পার পাইতেছে, কিন্তু এখানেও যখন বিচারকের ঐরূপ দায়িত্ব তখন যাহার এই কার্য্যকারণ-নিয়তিতে বিশ্ব সংসার চলিতেছে—তুমি কি মনে কর—তোমার পূজা লইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত নিয়ম উল্টাইয়া দিবেন ?

হরি। "তবে কি স্রষ্টার করুণা নাই ?—তিনি কি নিয়তিরূপ বজ্র লইয়া, দীন হীন সামান্য মনুষ্যের প্রতি কেবলি

তাহা শাসাইয়া রহিয়াছেন? তাহাদের তবে নিস্তার কোথা? তিনি মনুষ্যকে পূর্ণজ্ঞান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহাদের অকর্ম্মের দায়ী কে? তিনিই না কি?

স। এ সমস্তই তাঁহার করুণা। শাস্তির দ্বারা যতই মনুষ্য সংশোধিত হইতেছে ততই সে উন্নত জীব হইতেছে। কর্ম্মের জন্য যতই দায়ী হইতেছে, যতই সে কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে ততই সে উচ্চ জীব হইতেছে। অভিজ্ঞতা জন্মে কিসে? অভিজ্ঞতা কি আমাদের উন্নতির কারণ নহে?”

হরি। “কিন্তু তবে কি দেবপ্রসাদ বলিয়া কিছুই নাই? আমরা যখন দুঃখে তাপে কাতর হইয়া ডাকি আমাদের কি কেহ সাড়া দিবে না? আমরা পাপে তাপে মলিন হইয়া সান্ত্বনা চাহিলে কেহ কি কোলে লইবে না? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কি পিতা মাতা কেহ নাই, আমাদের হৃদয়ে প্রেম ঢালিবার কেহ নাই? পাষাণ নিয়তির মত পাষাণ দেবতা দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে টানিয়া চলিতেছেন?”

স। “না তাহা নহে বৎস। দেবপ্রসাদ অবশ্যই আছে। কিন্তু সচরাচর আমরা যে উপায়ে তাহা লাভ করিতে যাই—সে উপায় ঠিক নহে। তুমি যদি প্রতিদিন চুরি কর—আর বিচারালয়ে আসিয়া বিচারকের নিকট ক্রন্দন করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা কর তবে কি তাহা পাইতে পার? যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে চাও ত তাঁহার

নিয়মের অনুগামী হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর। একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মফলকে জয় করিতে পার, নিয়তিকে অতিক্রম করিতে পার, কেননা তাঁহার নিয়মানুযায়ী কাজ করিলেই মাত্র তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পার। বৎস তুমি জ্ঞানী হইয়া ইহা ভুলিলে কিরূপে! যাহার মঙ্গল করিতে চাও তাহার কর্ম্মকে সুপ্রসন্ন কর”—

এই সময় অদূরে কে ডাকিল “গুরুদেব”

সন্ন্যাসী উঠিলেন—বলিলেন, “যাহা বলিলাম একটু ভাবিয়া দেখিও, আমি এখন চলিলাম”।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, হরিতাচার্য্যের মনে আরো অনেক প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল—কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না, অতিথি-মন্দিরে আসিয়াও আর সে রাত্রে তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, অন্য যাত্রীদিগকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সকলে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল, বলিল “উঁহাকে জান না! উনি সিদ্ধ বাবা”—হরিতাচার্য্য বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন—এতদিন যাঁহার সন্ধানে বেড়াইতেছেন তাঁহার সহিত দেখা হইল—কথা হইল—তবু সব কথা হইল না, ব্যথিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “আজ কি আর এখানে আসিবেন?”

তাহারা বলিল “না উঁহার দেখা আর শীঘ্র পাইবে না—আর এক বৎসর পরে এই মেলায় আবার এইখানে উঁহাকে পাইবে।”

হরিতাচার্য্য তাঁহার অপেক্ষায় আর এক বৎসর বসিয়া রহিলেন—নিয়মিত সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইল, এবার আর তাঁহার হতাশ হইতে হইল না, যে জিজ্ঞাসার জন্য তিনি এতদিন দেশে বিদেশে কষ্টক্লেশ তুচ্ছ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎস সে দিন তোমার জিজ্ঞাসা না জানিয়া আমিত ইহারই উত্তর দিয়াছি। একজন আর একজনের অদৃষ্ট ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে না, নিজের কর্ম্ম দ্বারাই মাত্র নিজের নিয়তি ফিরাইতে পারা যায়। একজন কেবল তাহাকে পথ দেখাইতে পারে মাত্র।"

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আপনি সেই পথই দেখাইয়া দিন—যে পথে চলিয়া নাগাদিত্য বিপদোত্তীর্ণ হইবেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"পথ একমাত্র আছে—রাজর্ষি জনকের মত নাগাদিত্য যদি আত্মসংযতবান হইতে পারেন তবেই তিনি বর্ত্তমান অদৃষ্টকে জয় করিবেন। এ নিয়তি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল। নূতন জীবন লাভ করিলে নূতন কর্ম্মাধীন হইয়া এই নিয়তির খণ্ডন হইতে পারে। দুই উপায়ে নবজীবন পাওয়া যাইতে পারে—এক মৃত্যু দ্বারা আর এক যোগ দ্বারা, পাপময় প্রবৃত্তির নিধন দ্বারা। যদি তিনি মরিতে না চান ত তাঁহাকে নিবৃত্তি পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার অদৃষ্ট এড়াইবার ইহাই মাত্র পথ।"

এত দিন বিদেশে ঘুরিয়া, সন্ন্যাসীর এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আশাপূর্ণ চিত্তে হরিতাচার্য্য স্বদেশাভিমুখী হইলেন। নাগাদিত্যের সেই বালক মুখ যতই মনে পড়িতে লাগিল, তিনি ততই সে মুখে অপার্থিব আলোকজ্যোতি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ততই আশ্বস্ত হইতে লাগিল। এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া—নাগাদিত্যের বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দেশে ফিরিলেন। বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রকৃত বিপদ সম্ভাবনা নাই—সেই জন্যই হরিতাচার্য্য এতদিন বিলম্ব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে দিন দেশে ফিরিলেন—সেই দিনই ভীলদিগের বিচার। সেই বিচারে রাজার ক্ষমাশীলতা, উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আশা এতদূর বর্দ্ধিত হইল—যে তাহার সফলতা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচার শেষে তাঁহার সেই আশালোক সহসা যে ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল, সে মলিনতা ক্রমেই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি বুঝিতে লাগিলেন—যে, নাগাদিত্য উদার-প্রকৃতি, মহৎচেতা কিন্তু বিবেচনাশূন্য, আত্মাভিমানী। আত্মাভিমান দ্বারাই তিনি বিশেষরূপ চালিত। তোষা-মোদকারী সভাসদ পরিবেষ্টিত হইয়া দিন দিন তাঁহার এই দোষ বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন তাঁহার এই প্রবৃত্তিতে আহুতি পড়িতেছে। তাঁহার দোষ সংশোধনের কেহ নাই,

সভায় একজন এমন কেহ নাই যে সত্য কথা বলিয়া তাঁহার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করে, তাঁহার যথার্থ বন্ধুতার কাজ করে। আচার্য্য গণপতি—রাজার মঙ্গলই যাঁহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—যিনি রাজাকে চালাইবেন—তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভারু। পূর্ব্বে আচার্য্য বংশে যাহা কথনো হয় নাই এথন তাহাই হইয়া থাকে, রাজা যাহা বলেন তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য। হরিতাচার্য্য থাকিলে এতদূর ঘটিতে পারিত না, তাঁহার প্রবৃত্তিকে তিনি অন্ততঃ কতক পরিমাণেও বশে রাখিতে পারিতেন, এখন তাঁহাকে নিবৃত্তিপথে লইয়া যাওয়া একরূপ অসাধ্যসাধন, অদৃষ্ট যেন তাঁহাকে কবলস্থ করিবার জন্য চারিদিকের পথ মুক্ত করিয়া আনিতেছে। হরিতাচার্য্য নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়িলেন না, নাগাদিত্যের অদৃষ্টের সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম সঙ্কল্প করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

প্রভাত হইয়াছে, প্রত্যূষে স্নানান্তে আরতি সমাপন করিয়া হরিতাচার্য্য মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছেন, মৃদুল পবন হিল্লোলে নদী বক্ষে এক একটি বীচি সঞ্চালিত হইয়া

ধীরে ধীরে উপকূলে আসিয়া লাগিতেছে, উপকূলে প্রতিহত হইয়া আবার সহস্র তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া সরিয়া সরিয়া পড়িতেছে; হরিতাচার্য্য তাহাই দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন এ বিশ্ব সংসার সমস্তই বুঝি কালের তরঙ্গ, কালের স্রোত। এ স্রোত চলিয়াছে চলিয়াছে কেবলি চলিয়াছে. অদৃষ্ট-নিয়তির উপকূলে প্রতিহত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া কেবলি ভাসিয়া চলিয়াছে। এ গতি তাহার কে বা থামায়? কে বা তাহাকে ধরিয়া রাখে! কোন মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে মহান অর্থ পূরণ করিতে কালের এই অনন্তগতি ভগবান তুমিই তাহা জান?”

এখনো ভাল করিয়া রৌদ্র উঠে নাই, নদীতে লোক জনের বেশী ভীড় নাই, মন্দিরের ঘাটের পার্শ্বে কিছু দূরে একটা আঘাটায় কয়েক জন স্ত্রী পুরুষ মাত্র স্নান করিতেছিল, হরিতাচার্য্য দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি বালিকা জল ভাঙ্গিয়া ঘাটের দিকে আসিতেছে। ক্রমে সে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি স্নান করিবার সময় নদীর জলে তিনটি পদ্ম ভাসাইয়া আসিয়াছিলেন—তাহার দুইটি দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল একটি নিকটেই ভাসিতেছিল, নিকটেরটিকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিল, হরিতাচার্য্য অবাক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য-জ্যোতিতে প্রভাত যেন ভরিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল সে যেন অন্য জগতের অশরীরি একখানি লাবণ্য ছায়া,

কোন নন্দন কাননের একটি সুবাসময়ী ফুল, কোন স্বপ্নের যেন একটি জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা মর্ত্ত্য রাজ্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। এই সময় গোল উঠিল—রাজা আসিতেছেন—রাজা আসিতেছেন। দূরের আঘাটা হইতে একজন ডাকিল "রাজা আউছুরে এদিক পানে আয়" এখনো বালিকার দুইটি ফুল ধরিতে বাকী আছে—জলে শরীর ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি সেই দিকে সে পদ বাড়াইল। জলের আঘাত পাইয়া ফুল দুটি আর একটু সরিয়া গেল, বালিকা ব্যস্ত হইয়া আবার পা বাড়াইল, এই সময় একজন জলে নামিয়া বলিলেন—"সুন্দরি দাঁড়াও আমি ধরিয়া দিতেছি"—বালিকা ফুল ধরা ছাড়িয়া সচকিতে তাঁহার দিকে চাহিল, দেখিল—পরিচিত স্বরূপ সুন্দর দেবমূর্ত্তি। তাহার পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল—ছেলেবেলা সে তাহাকে বর বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল মনে পড়িয়া গেল—লজ্জায় মুখটি আরক্তিম হইয়া উঠিল, রাজা যখন ফুল দুটি তাহার হাতে দিলেন সে আনত দৃষ্টিতেই তাহা ধরিল। এই সময় জুমিয়া ওঘাট হইতে এ ঘাটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল—"সুহার রাজাকে প্রণাম কর" সুহার একটু ইতস্ততঃ করিয়া জলের উপরেই ঢপ করিয়া মাথাটা নুয়াইল। জুমিয়া বলিল "মহারাজ আমার মেয়ে"—

জুমিয়ার মেয়ে সেই বালিকা! বেল ফুলের মত সেই ফুটফুটে বালিকাটি এখন পদ্মের মত বিকশিত হইয়া

উঠিয়াছে! রাজার কয়েক জন সভাসদ সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, দু একজন জলের উপরই দাঁড়াইয়াছিল—জুমিয়ার মেয়ে শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল—বলিল "জুমিয়া তোমার মেয়ে এত সুন্দরী"—

জুমিয়া কোন কথা কহিল না—কেবল হাসিল। রাজা এতক্ষণ ভাল করিয়া তাহাকে দেখেন নাই, রাজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সত্য! ও হাতে পদ্মগুলিও যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে—" সহসা বালিকার হাত হইতে ফুলগুলি পড়িয়া গেল, রাজা তুলিয়া দিলেন, বালিকা ফুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে তাহার পিতার সহিত অন্য ঘাটে সরিয়া গেল।

পুরোহিত মন্দিরের মধ্য হইতে এ সকল দেখিতে পাইলেন,—একটা অন্ধকার আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল, কাল রাজার জন্মতিথির উৎসব আসিতেছে, আজ তাঁহার বিংশ বৎসর পূর্ণ! রাজার ভবিষ্যতের একটা রুদ্ধ দ্বার সহসা যেন তাহার চক্ষে উন্মুক্ত হইল। রাজার অষ্টমে শনি কেতুর দৃষ্টি মনে পড়িয়া গেল, সন্ন্যাসীর কথা—"রাজার সংযতবান জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক—" মনে পড়িয়া গেল, পুরোহিত দুশ্চিন্তা ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। রাজা স্নানের পর দেব প্রণাম করিতে আসিলে হরিতাচার্য্য তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বৎস প্রবৃত্তির মত রিপু আর নাই, তোমার সম্মুখে

ভয়ানক বিপদ, একমাত্র প্রবৃত্তি জয় দ্বারাই তুমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পার—সাবধান হও বৎস সাবধান হও—”

সহসা এরূপ কথার অর্থ রাজা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইলেন—বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিতাচার্য্য বলিলেন, “বৎস অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্তি মহাপাপ—পুরুষের তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকাই উচিত—এরূপ প্রবৃত্তি যে দমন না করে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।”

রাজা এইবার তাঁহার কথার অর্থ বুঝিলেন। হরিতাচার্য্যের এই অন্যায় সন্দেহে রাজা বিরক্ত হইলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন “ঠাকুর—আমি বিশুদ্ধ, আপনার ভয়ের কোন আবশ্যক নাই”—

হরিতাচার্য্য বলিলেন “নিজের উপর অত বিশ্বাস করিতে নাই—আমরা অসম্পূর্ণ জীব, সাবধান না হইলে প্রতি নিমেষেই আমাদের পদস্খলন হইতে পারে—প্রলোভনের নিকট হইতে আমরা যত দূরে থাকি ততই ভাল—বৎস আজ যে বালিকার সহিত তোমাকে দেখিলাম তাহার নিকট হইতে তুমি দূরে থাকিও; নহিলে অজ্ঞাতে তুমি বিপদের পথে যাইবে, তখন আর ইচ্ছা করিলেও সরিতে পারিবে না।”

বিনা প্রার্থনায় বিনা প্রয়োজনে জোর করিয়া উপদেশ

গলায় গুজিয়া দেওয়ার মত সংসারে অপ্রীতিকর বস্তু কমই আছে। রাজা পুরোহিত-বাক্যে আর কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। এ সমস্তই তাঁহার বৃথা সন্দেহ মনে হইল। মনে করিলেন এত অল্পে যাহারা পাপ সন্দেহ করে তাহারাই কি ঘোর পাপী নহে। এ কথা মনে করিয়াই সহসা শিহরিয়া উঠিলেন—ইহাতে আচার্য্যের উপর দোষ স্পর্শে! তাড়াতাড়ি মন হইতে এ কথা তাড়াইয়া ভাবিলেন যাহারা চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতেছে—যাহারা স্ত্রীলোক দেখিলেই সরিয়া যাইতে শিক্ষা করে—তাহারা সহজেই স্ত্রীলোক হইতে আশঙ্কা কল্পনা করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক রাজার মনে হরিতাচার্য্যের কথায় ভাল ফল হইল না।

আকাশের তারা নক্ষত্রের সহিত মনুষ্য জীবনের সম্বন্ধ লইয়াই হরিতাচার্য্য ব্যস্ত, শাস্ত্রের কূট যুক্তি লইয়াই হরিতাচার্য্যের মস্তক আলোড়িত কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোন ক্ষুদ্র তারে ঘা পড়িলে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে—তাহা তিনি বুঝেন না, সে বিজ্ঞানে তিনি অনভিজ্ঞ। সুতরাং সে বিষয়ে কথা কহিতে গিয়া যে তিনি বিপরীত করিয়া বসিবেন—তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রাজাকে এইরূপ পরামর্শ দান করিয়া তিনি মনে মনে সন্তোষ লাভ করিলেন, রাজা যখন গম্ভীর হইয়া

চলিয়া গেলেন তিনি ভাবিলেন তাঁহার কথায় নিশ্চয়ই গুণ ধরিয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

স্তব্ধনিশায়, নির্জ্জন মন্দিরে দুইজনের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

গণপতি বলিলেন—"দেব—আর প্রতীক্ষায় রাখিবেন না, আপনার ভ্রাতা আমাকে শিষ্য করিয়া গিয়াছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সে পদ বজায় রাখুন—আমাকে শিষ্য বলিয়া চরণে রাখুন।" গণপতি হরিতাচার্য্যের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি, হরিতাচার্য্যের অবর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতার শিষ্য হইয়া তিনি এ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হরিতাচার্য্য এক দিন আসিয়া গণপতির এ অধিকার যে গ্রহণ করিবেন একথা তাঁহার মনেও হয় নাই। এত দিন হরিতাচার্য্যের দেখা নাই সকলেই ভাবিত তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাঁহার অধিকার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি যদি শিষ্য করিয়া যান তবেই তাঁহার অবর্ত্তমানে গণপতি এই মন্দিরের অধিপতি হইতে পারেন—নহিলে তাঁহার আশা

ভরসা নাই। গণপতির চিরপরিচিত মন্দির কক্ষাদি আজ আর তাঁহার নহে, আজ তিনি আপনার রাজ্যে দাঁড়াইয়া পরের অনুগ্রহের ভিখারী, পরিচিতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকলি আজ তাঁহার অপরিচিত। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ঔৎসুক্য পূর্ণ নেত্রে হরিতাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—হরিতাচার্য্য বলিলেন—"পুরোহিতের কাজ তোমার নহে বৎস। পুরোহিতের কর্ত্তব্য রাজার তোযামোদ নহে, তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর করা। তাহা যে না পারে তাহাকে আমার শিষ্য বলিব কিরূপে?"

গণপতির মুখ মলিন হইয়া গেল—মুখে কথা ফুটিল না। হরিতাচার্য্য আবার বলিলেন—"কেবল শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া লোকের সম্মান উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্তে জীবন কাটাইবার জন্যই একলিঙ্গদেবের পুরোহিত হওয়া নহে। যদি সমস্ত রাজ্যের শুভাশুভের দায়িত্ব ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইতে পার—তবেই পুরোহিত হও"—

গণপতি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু অবিচার করিবেন না—রাজা যথেচ্ছাচারী হইলে আমাদের কর্ত্তব্য পালনের উপায় কি? তিনি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করেন কি?"

পুরোহিত বলিলেন—"তিনি গ্রহণ করুন, না করুন তাহা তোমার ভাবিবার আবশ্যক নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়াছ কি? তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর করিতে কি চেষ্টা করা হইয়াছে?

গণপতি বলিলেন—"কিন্তু তাহার কিরূপ ফল হয়—আপনিই ত দেখিতেছেন,—আপনিইত পারিতেছেন না"—

হরিতাচার্য্য উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—'আমি না পারি—চেষ্টার ত্রুটি করিব না। না পারি পৌরোহিত্য ত্যাগ করিব"—

খানিকক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। গণপতি খানিক পরে বলিলেন "প্রভু এরূপ শিক্ষা আগে পাই নাই। আমাকে ত্যাগ করিবেন না, আমাকে আপনার মত করিয়া লউন।"

হরিতাচার্য্য খানিকটা ভাবিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা বৎস, তাহাই হইবে। উপযুক্ত হইতে যদি সমর্থ হও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমার যোগ্যতা দেখিতে ইচ্ছা করি"—

গণপতির যে মনের মত কথা হইল তাহা নহে, উপযুক্ত হইব বলা যেমন সহজ,—উপযুক্ততা দেখান তেমন নহে। তথাপি ইহার উপর কথা কহিতে আর সাহস করিলেন না, বুঝিলেন্ তাহা বৃথা। গণপতি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনিও একটু পরে কক্ষ হইতে উঠিয়া মন্দিরের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন—স্তব্ধ নিশা জ্যোৎস্না প্লাবিত। নিকটের শুভ্র মন্দির শুভ্র প্রাসাদ শুভ্রতর করিয়া, নদীর তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া, পরপারের কৃষ্ণপাহাড় শ্রেণী কৃষ্ণ মেঘের

মত সুস্পষ্ট করিয়া, বিশ্বচরাচরকে আপন প্রেমের হাসিতে হাসাইয়া তুলিয়া সেই রজত-কৌমুদী কে জানে কোন অনন্তের উদ্দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া হরিতাচার্য্য ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, কত-স্মৃতি তাহার হৃদয় দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, বিদেশ যাত্রার আগের দিন দুই ভ্রাতায় নদীতীরের একটি নাগ-কেশর তলায় বসিয়া যে এইরূপ একটি জ্যোৎস্নাময়ী নিশা যাপন করিয়াছিলেন, তাহা বড় মনে পড়িতে লাগিল। আজ সে নাগকেশরের চিহ্নমাত্র নাই, আর যাহার সহিত কথোপকথনে সে রাত্রি মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গিয়াছিল—যাহার উৎসাহ বাক্য বিদেশে কষ্ট দুঃখের মধ্যেও তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল—সে ভ্রাতা তাঁর কোথায়? আর আর? সে সব কিছুই নাই! এই দশবৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! কতকি নাই—কতকি নূতন হইয়াছে! সেই কোমল বালক নাগাদিত্য এখন যুবক যথেচ্ছাচারী রাজা! হরিতাচার্য্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—চারিদিকের এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সম্মুখের মন্দির কক্ষটি অনিত্যের স্থির প্রতিমা স্বরূপ তাঁহার নয়নে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি বিদেশ যাত্রার সময়—এ কক্ষের যেখানে যাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন আজও তাহাই আছে, কক্ষের কোলঙ্গায় কোলঙ্গায় সেই পুঁথির রাশি—দেয়ালে দেয়ালে সেই দেব-

দেবীর চিত্রপট, গৃহের মধ্যস্থলে দেব দেব মহাদেব তেমনি অটল ভাবে বিরাজিত,—এ মন্দিরের কিছুই পরিবর্ত্তন নাই। হরিতাচার্য্য একলিঙ্গের সম্মুখস্থ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন—ভগবান সকলি তোমার ইচ্ছা, ক্ষুদ্র মনুষ্য হইয়া ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া কেন তবে অদৃষ্ট-অনন্তশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে এ ইচ্ছা, এ প্রবৃত্তি? যখন যুঝিবার এ প্রবৃত্তি—এ ইচ্ছা রহিয়াছে তখন অবশ্যই অদৃষ্টের উপর আধিপত্য রহিয়াছে। ভগবান, তুমি জ্ঞান দিয়াছ—ইচ্ছা দিয়াছ—অথচ সে জ্ঞানের কোন সফলতা দেও নাই, অন্ধ অদৃষ্ট দিয়াছ ইহা কথনো হইতে পারে না। তবে প্রভু বল দেও—অদৃষ্টকে অধিকারে আনিতে তাহার বল দেও—" করযোড়ে কায়মনে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দ্বিপ্রহরের যখন নহবৎ বাজিল—তখন উঠিয়া আরাত আরম্ভ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মজলিষ।

অন্তঃপুরের খাস মজলিষ। বিকালবেলায় সাজ সজ্জার পর মহিষী সেমন্তী সখিদিগকে লইয়া প্রমোদ গৃহে বসিয়াছেন, যুবতীগণের কাহারো হাতে বীণা, কাহারো হাতে

সেতারা, কাহারো কোলে ঢোল কেহ বা মন্দিরা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা বসিয়া বসিয়া পায়ে ঘুঙ্গুর পরিতেছেন, এখনি নৃত্যগীতের একটা মহা ধূম পড়িয়া যাইবে, আয়োজন সবই ঠিক তবু সমস্তই বেঠিক, কোন্ গানটি যে আগে আরম্ভ হইবে সেই অবধি তাহা ঠিক হইয়া উঠিল না—লক্ষ্মী বলিলেন 'সেইটে ধর—এ ক্যায়সে পীরিতি বঁধুয়া,'

শ্যামা বলিল 'না, ওটা না, সেইটে, রাধা নামে বাজল বাঁশরী,'

অন্নপূর্ণা বলিল 'না না, বাজল রুণুঝুনু নাচ সহচরী,—

মহিষী বলিলেন 'আচ্ছা এইটাই হোক'

কিন্তু চম্পা তাহাতে আপত্তি করিলেন 'ছিঃ ওটা পচা,'

চামেলি বলিলেন 'তোর কাছে পচেছে আমাদের পচেনি, ঐটেই হোক,'

এইরূপে কোনটি গাহা হইবে তাহা লইয়া একের সঙ্গে অপরের সম্পূর্ণ মতের অনৈক্য দাঁড়াইতে লাগিল, অবশেষে সর্ব্ববাদী-সম্মত না হউক একটি গান স্থির করিয়া মহিষী বলিলেন 'ঐটেই গা, আর গোল করিস নে'।

যাহাকে বলিলেন সে বলিল "তুমি আগে গাও" তখন এক গোল হইতে আর এক গোল পড়িয়া গেল, সকলেই সকলকে বলিতে লাগিল 'তুমি আগে গাও'!

গোলযোগ দেখিয়া মহিষী গাহিতে যাইতেছেন, তান-

পূরায় সুর দিয়াছেন—এই সময় তাঁহার দুই বৎসরের শিশু পুত্র ছুটিয়া আসিয়া তানপূরার কাছে কোলের উপর এক রকম করিয়া স্থান করিয়া লইল। ঘরের কোণে একটা মস্ত পাখোয়াজ ছিল সেই পাখোয়াজটাকে টানা হেঁচড়া করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া এতক্ষণ সে কোন প্রকারে এখানে আনিবার উদ্যোগে ছিল, রাণী তানপূরায় সুর দিবামাত্র পাখোয়াজটা ফেলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল "হ্যাঁ গাও"

কিন্তু ইহাতে কি আর গান হয়? মহিষী তানপূরাটা ফেলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন—শ্যামাকে বলিলেন "না তুই ধর, তোর সঙ্গে আমি ধরিতেছি।"

শিশু তাহা শুনিয়া আধো আধো সুরে বলিয়া উঠিল "না তুমি গাও ধামা গাবে না, হাঁ গাও"

মহিষী আবার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন বলিলেন—"না ধ্যামা গাবে না, আমার বাপ্পু গাবে, গা, দেখি একটা"

বাপ্পু বলিল "না তুমি গাও' রাণী বলিলেন "আচ্ছা আমি গাহিতেছি তুই আমার সঙ্গে গা" বাপ্পু বলিল 'আচ্ছা'—রাণী গাহিলেন

মধু বসন্ত সখিরে—
যৌবন-আকুল—ফুল্ল কুসুম কুল
উলসিত ঢল ঢল শশীকর মাখি রে।

সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কলকল,
কুহরত কুহু কুহু নিকুঞ্জে পাখী রে।
সুহাসিত যামিনী, সচকিত কামিনী
কম্পিত হিয়াপর ঝর ঝর আঁখি রে।
কাঁহা বৃন্দাবন হরি? কাঁহে মধু বাঁশরী
বাজিল না আজু মরি রাধা রাধা ডাকি রে।

বালক আধো আধো অস্পষ্ট সুরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল, সখীরা আস্তে আস্তে মন্দিরা বাজাইতে লাগিল, আস্তে আস্তে তানপূরাতে সুর ধরিল, সেই মধুর সঙ্গীত নিস্তব্ধে সকলে শুনিতে লাগিল। দুই একবার গাহিয়া রাণী থামিলেন, বালক বলিল "আর একটা"

রাণী বলিলেন "ঐ শ্যামাকে বল"

বালক মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল "না ধ্যামা না, তুমি"

রাণী বলিলেন—"তবে শ্যামা রাগ করবে"।

শ্যামা বলিল "হঁ্যা তবে আমি কাঁদব"।

বালক তবুও বলিল "না ধ্যামা না, মা গাবে"।

শ্যামা বলিল 'তবে আমি রাগ করলুম, আয় চম্পা আমরা আর এখানে থাকব না"।

চাঁপার হাত ধরিয়া শ্যামা গৃহের বাহির হইল, বালক কাঁদিল, 'ধ্যামা ধ্যামা যাবে না"।

ধ্যামা বলিল "ধ্যামা রাগ করেছে; আর কি ধ্যামা

থাকে''।—বলিয়া চাঁপাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। রাণী বলিলেন "রকম দেখ ছেলেকে কাঁদিয়ে গেল"।

তিনি আদর করিতে লাগিলেন, সে আবদার করিতে করিতে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, গানের পালা এইরূপ করিয়া শেষ হইল। সখীরা যন্ত্রাদি যেখানকার যা উঠাইয়া রাখিয়া আপন আপন কাজে কর্ম্মে গেল, রাণী ঘুমন্ত ছেলেকে দাসীর কোলে দিয়া বলিলেন—"তারা গেল কোথায় রে ?"

"দাসী বলিল "কারা মা" ?

রাণী বলিলেন "শ্যামা আর চাঁপা ?"

দাসী বলিল "তারা ঐ বাগানে গাছতলায় গিয়া বসে আছে"।

রাণীও বাগানে গমন করিলেন, আড়াল হইতে গিয়া একজনের চোখ টিপিয়া ধরিবেন ভাবিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে আর সব ভুলিয়া গেলেন—শুনিলেন শ্যামা বলিতেছে "সত্যি ভীলের মেয়ে এত সুন্দরী ? আমাদের রাণী থাকতে রাজা তার রূপে মুগ্ধ ?"

চাঁপা বলিল "সত্যি না ত কি মিথ্যে ? লোকেরা কি বলছে তা বুঝি জানিসনে ?"

"কি বল দেখি ?"

"ভীলেরা রাজাকে খুন করতে গিয়েছিল তবুও যে রাজা

তাদের ছেড়ে দিলেন সে আর কিছু না কেবল ভীলের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে।"

রাণী আর লুকাইয়া রহিলেন না, নিকটে আসিয়া বলিলেন "কি কথা হচ্ছে? তোদের ভীলের মেয়ে কে সুন্দরী?"

রাণীকে দেখিয়া তাহারা জড় সড় হইয়া পড়িল। শ্যামা বলিল—"ঐ চাঁপা বলিতেছিল।"

চাঁপা বলিল "মাগো শ্যামা এত জানে, আমি না শুনলে কি আর বলি?"

শ্যামার উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

শ্যামা বলিল "আমি কি বলছি যে না শুনে তুই বলেছিস? ও ওর স্বামীর কাছে এ সব কথা শুনেছে"।

চাঁপা একজন সভাসদের পত্নী, রাজমহিষীর কাছে সর্ব্বদাই আসিত। রাণী বলিলেন—"তা যার কাছেই শুনেছিস তাকে বলিস এ রকম মিথ্যা কথা কয়ে রাজার নামে কলঙ্ক দিলে ভাল হবে না—আর তোরা যদি এ কথা বলাবলি করবি তো তোদের মুখ দেখব না"। রাণী রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী স্ত্রী।

সে দিন রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। কতদিন হইল ভীলদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে এতদিন পরে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা—বৃদ্ধের মত গম্ভীর ভাবে—রাজার উপর রাজা হইয়া তাঁহার সেই বিচারের বিচার করিতেছিলেন। কথার মধ্যে রাণী কহিলেন—"দোষীকে শাস্তি না দেওয়া কি অবিচার নহে?"

রাজা বলিলেন—"দোষের প্রমাণ?"

মহিষী। কেন যেরূপ অবস্থা—তাহাতে আর কি প্রমাণ চাও?

রাজা। "উহারা যে দোষ একেবারেই অস্বীকার করে।"

মহিষী বলিলেন—"রাজার আমাদের খুব বিদ্যে। দোষ ক'রে আবার কে স্বীকার করে? তা হ'লে কি বিচারালয়ের আবশ্যক হোত?

রাজা একটু হাসিলেন, বলিলেন—"ভীলেরা মিথ্যা বলে না।"

মহিষী বলিলেন—"না ভীলেরা মিথ্যা বলে না, যত মিথ্যা আমরাই বলি, আমাদের জন্যই তোমার বিচারালয়।"

রাজা দেখিলেন এরূপে কথা কহিয়া তিনি রাণীর সঙ্গে পারিবেন না—বলিলেন "আচ্ছা না হয় আমি দোষী-দিগকেই ক্ষমা করিয়াছি সেত সুখেরই কথা। দোষীদের লঘু শাস্তির জন্য অন্য সময় তুমি আমাকে কত অনুনয় কর বলদেখি? আজ তোমার স্বভাবে অভাব?"

রাণী দেখিলেন তিনি হঠিয়া যান, কিন্তু আপাততঃ তাঁহার নিতান্তই ইচ্ছা—রাজার বিচারটা ঠিক হয় নাই ইহা রাজার মুখ দিয়া স্বীকার করান, সুতরাং ছোট, সুন্দর-মুখখানি আরো একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন—

"আমাদের স্ত্রীলোকের প্রাণ, ন্যায়রূপে হউক অন্যায় রূপে হউক—কাহাকেও কষ্ট পাইতে দেখিলে তাহার উপ-শম করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য রাজার কর্ত্তব্য এক নহে। এক সময়ে আমরা একজনের সুখ দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল ছাড়া ভাবিতে পারি না, তুমি রাজা সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল—সুখ দুঃখ তোমার হস্তে, সুতরাং রাজ্যের মঙ্গল রক্ষা করিতে হইলে বিচার-নিয়ম তুমি ভঙ্গ করিতে পার না, একজন দোষীকেও তুমি বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিতে পার না।"

রাজা বলিলেন—"সত্য কথা। কিন্তু একদিকে আমি আমি যেমন রাজা—অন্য দিকে তেমনি মানুষ। আমার রাজার কর্ত্তব্য আছে মানুষের কর্ত্তব্য নাই? এক প্রজা-

হইতে অন্য প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যখন সিংহাসনে বসি—তখন আমি রাজা;—তখন আমি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দোষীকে ক্ষমা করিতে পারি না। কিন্তু আমার নিজের প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে তাহাকে ক্ষমা করিতে আমার অধিকার আছে, আমি রাজা প্রজার সম্পর্কে; কিন্তু নিজের সম্পর্কে আমি মানুষ, মানুষকে মানুষ ক্ষমা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহাকে আমি যদি শাস্তি দিই—তাহাকে তুমি বিচার বলিতে পার না, তাহা প্রতিশোধ। প্রতিশোধ মনুষ্যের গুণ ক্ষমা দেবতার। এ সম্বন্ধে আমাকে দেবতা হইতে দাও।”

এ যুক্তির ভুল কোথায় রাণী ধরিতে পারিলেন না, একটা গর্ব্বময় আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় কেবল প্লাবিত হইয়া উঠিল, তিনি তর্ক ভুলিয়া দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন—রাজা তাঁহার আহ্লাদ বুঝিয়া হাসিয়া ধীরে ধীরে কপালে চুম্বন করিলেন।

খানিক পরে সহসা রাণী মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন “মহারাজ, আর একটা কথা শুনিতেছি, কুজ্বা নাকি রাজমহিষী হইবে, ভীলের মেয়ের রূপে নাকি ভুলিয়াছ?”

রাজা মহিষীর অলকগুচ্ছ ধরিয়া ধীরে ধীরে একটু নাড়াইয়া বলিলেন—“যে ভুলের মধ্যে ডুবিয়া আছি—এইটাই ভাঙ্গুক আগে।”

মহিষী বলিলেন—"তোমার না ভাঙ্গুক লোকে যে আমার ভুল ভাঙ্গাইতে ব্যস্ত।"

রাজা সোহাগ করিয়া বলিলেন—"লোকগুলা অধঃপাতে যায় না কেন? তাহাদের জীবনে কি আর কাজ নাই?"

রাণী হাসিয়া প্রেমপূর্ণ উথলিত চিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—বলিলেন "আমার এমন রাগ হয়েছিল? দেখ দেখি তোমার নামে কি না এই রকম করে বলে।"

রাজা হাসিয়া তাহার গাল ধরিয়া টিপিয়া দিলেন। রাণীর সব রাগ গলিয়া জল হইয়া গেল। তিনি সখীদের কথা যাহা শুনিয়াছেন হাসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন—কয় মাস পূর্ব্বে পুরোহিত যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল, তাহার পর আবার এই সব! রাজা বলিলেন "লোক আকাশেও বাড়ী বানাইতে পারে।"

রাণী সোহাগের স্বরে বলিলেন—"তা বানাক্। তাতে ত আর কারো গায়ে ফোস্কা পড়িবে না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গীত-আহ্বান।

কোন কবি গাহিয়াছেন—

"প্রতি দিন শত আঁখি পরে—
কত ফুল ফোটে আর ঝরে,
একদিন একটি সে ফুল,
করি শুধু কবিরে আকুল
বাঁচিয়ে থাকে সে কবিতায়,
অন্যে যবে মৃত্যু কোলে ধায়।
প্রতি দিন শ্বেত পীত রাঙ্গা
কত শত মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
আকাশে ভাসিছে স্তরেস্তর,
একটি রঙ্গিন শুধু থর
ধরি তার রাখে চিত্র কর।
ধরা মাঝে থাকে সে অমর।
একটি সে মধুর তাকানি
আধো ফোটা দু একটি বাণী,
কোনক্ষণে কখন কে জানে,
কেমনে আসিয়া পড়ে প্রাণে,
কেমনে বাজে গো কাণে হায়,
সহসা সে প্রেমেরে ফুটায়"।—

মধুর ভাষায় জলন্ত সত্য! একজনের জীবনের পথে কত জন প্রতিদিন আনাগোনা করিতেছে সে তাহাদের প্রতি চাহিয়াও দেখে না, কিন্তু একদিন একজনের এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে, একটি সামান্য কথায় তাহার অনন্ত জীবনে যেন বিপ্লব জাগিয়া উঠে।

রাজা সে কি মুহূর্ত্তে কি মায়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন "ও হাতে পদ্মও মলিন হইয়া পড়িয়াছে" সেই কথা গুলি সেই অবধি সঙ্গীত হইতেও মধুর স্বরে বালিকার কাণে বাজিতেছে, সেই কথায় তাহার ছোট্ট প্রাণের মধ্যে একটা নূতনতর সুখের উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে।

তাহাকে যে আর কেহ কখনো সুন্দরী বলে নাই তাহা নহে, বাড়ীর সকলেই তাহাকে সুন্দরী বলে, যে যখন তাহাকে দেখে সুন্দরী বলে। সম্প্রতি ইদরে আসিয়া অবধি ক্ষেতিয়া ত অষ্টপ্রহর তাহাকে সুন্দরী বলিতেছে, ক্ষেতিয়ার এই অতিরিক্ত স্তুতিবাদ বালিকার নিকট এতই বিরক্তিজনক যে, কেহ সুন্দরী বলিলে বিরক্তির বদলে যে আবার আহ্লাদও হইতে পারে ইতি পূর্ব্বে তাহার সে জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না।

আজ তাহার যতই মনে পড়িতেছে "ও হাতে পদ্মও মলিন"—ততই তাহার হৃদয়ে একটা সুখের উৎস ছুটিতেছে, আর ততই তাহার মনে হইতেছে, "এ কথা কেন বলিলেন? রাজা কি সকলকেই এইরূপ বলেন? ফুলের

মত কি কেহ সুন্দরী হয়? এ বুঝি উপহাস?" হউক উপহাস—কি উপভোগ্য উপহাস, এ উপহাস তাহার হৃদয়ে যে নূতন আনন্দ রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে! আজ সে যাহা দেখিতেছে তাহাতেই তাহার আনন্দ হইতেছে—তাহার প্রতিই তাহার ভালবাসা জন্মিতেছে। অন্য দিন ক্ষেতিয়কে দেখিলেই সে পালাইবার চেষ্টা করিত, আজ তাহাকে পর্যান্ত দেখিয়া সে আহ্লাদ প্রকাশ করিল, তাহার সঙ্গে হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল, এমন কি, ক্ষেতিয়া যখন উথলিত হৃদয়ে তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল, তখনো রাগ না করিয়া বালিকা হাসিমুখে তাহা শুনিতে লাগিল। ক্ষেতিয়া তাহাতে এতদূর আহ্লাদিত এতদূর আশ্বস্ত হইল, তাহাতে তাহার এতখানি সাহস বাড়িয়া গেল—যে আজ সে অসঙ্কোচে বলিল—"জোয়ানি, মোর গরু ছাগল তোর হউবে, মোর ঘর তোর হউবে, মুই তোরে শীকার আনি দিবু, মুই তোরে গহনা পরাউবু, তুই মোর ঘর করুবি?"

এটা তাহার বিবাহের প্রস্তাব। সুসভ্য ও অসভ্যের প্রথা আর কি এখানে অনেকটা একই রকম। বলা বাহুল্য সাধারণতঃ অসভ্যদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, এবং বিবাহে কন্যার সম্মতি আবশ্যক। তবে আজ কাল স্থানে স্থানে যে ব্যভিচার দেখা যায় সে আমাদের সংসর্গের ফল।

বালিকা তখন বড় রাগিয়া উঠিল, বলিল—"দূব হ তুই" বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল, মাবের সঙ্গে মিশিয়া ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল, কাজের মধ্যে দশ শ-বার শিশুর মত মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

মা বলিলেন "এত্তটা বড় হউছে তবু দেখ না ছেলে মানুষ! যা তোর দাদারে খাওয়ায়ে আয়" স্নহার অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া দাদার কাছে গেল, দাদা খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিলেন, সে আনমনে শুনিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল "ও হাতে পদ্মও ম্লান"—মাঝে মাঝে হৃদয়ে একটা বিদ্যুৎ বহিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার সে নদীতে স্নান করিতে গেল, আগের দিনের মত আঘাটায় না'মিল, অনতি দূরেই মন্দিরের ঘাট, আজও জলে কয়েকটি পদ্ম ভাসিতেছে—ঘাটে গিয়া সেই পদ্মগুলি ধরিতে আজো তাহার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কে জানে হঠাৎ আজ তাহার কেন এ বাধ বাধ ভাব!

বালিকাদিগের হঠাৎ বিবাহের পরদিন যেমন যুবতীর লজ্জার ভাব আসিয়া পড়ে, আগের দিন যে সকল পরিচিত পুরুষের সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিয়াছে,—তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেও যেমন ঘোমটা না টানিয়া তাহারা থাকিতে পারে না, সেইরূপ কি এক সঙ্কোচ কি এক লজ্জার ভাবে

বালিকা বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। কে জানে কেন তাহার এ লজ্জা! সে ত শুধু ফুল কুড়াইতে যাইতে চায়—শুধু ফুল তুলিতে! আর কোন কারণে নহে, আর কাহাকে দেখিতে নহে, নিশ্চয়ই নহে, তবে কেন তাহার এত লজ্জা! সে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে রাজা মন্দির ঘাটে স্নানে আগমন করিলেন, বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ঘাটে যাইবে কি—তাড়াতাড়ি সে কূলে উঠিয়া পড়িল, কূলে উঠিয়া একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল—তাহার সঙ্গীরা যখন স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল তাহাদের সহিত গৃহাভিমুখী হইল।

সেই দিন হইতে প্রতিদিনই সে নদীতে স্নান করিতে যায়, যে দিন রাজাকে দেখিতে পায় তাহার দেব দর্শনের আনন্দ জন্মে, সেই প্রাণভরা আনন্দ লইয়া মনে মনে সে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করে, যে দিন রাজা স্নানে না আসেন সে দিন ম্লান নিরানন্দ ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসে। কিন্তু তাঁহার দর্শনের আনন্দের ন্যায় অদর্শনের এই নিরানন্দও তাহার নিকট উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়, কৃপণের সম্পত্তির মত এই সুখ দুঃখ সে হৃদয়ের নিভৃতে লুকাইয়া ভোগ করে, ইহা ছাড়া এ সম্বন্ধে সে আর কিছু ভাবে না। সে যে রাজাকে ভাল বাসিয়াছে, এই ভালবাসাই যে তাঁহার সুখ দুঃখের কারণ, এ সুখ দুঃখ ভোগে তাহার অধিকার আছে কি না, এ ভালবাসা তাহার উচিত কি অনুচিত—

এ সকল কথা তাহার কখনো মনে আসে না,—কেনই বা আসিবে? দেবতাকে কে না ভালবাসে, কেনা তাহার দর্শন পাইতে চায়? কিন্তু দেবতাকে ভালবাসিয়া কে আবার সে ভালবাসার ঔচিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করে? সে কথা না কি কখনো কাহারো মনে উদয় হয়?

বালিকার ও সকল কথা কিছুই মনে আসে না, রাজার দেবমূর্ত্তি সে কেবল সর্ব্বদাই নয়নের উপর দেখিতে পায়। তাঁহার সেই কথাগুলি কেবল বীণার মতন তাহার কর্ণে বাজিতে থাকে, তাঁহার দর্শন অদর্শনের সুখ দুঃখ মাত্র সে কেবল তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করে, ইহা ছাড়া আর সে কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু ভাবে না। এই বিশুদ্ধ দেব-প্রীতিতে যে কিছু অমঙ্গল ঘটিতে পারে, ইহাতে যে কলঙ্ক লুক্কায়িত থাকিতে পারে, ইহা সে সরল বালিকার বুদ্ধির অতীত, সুতরাং ইহা তাহার মনের ত্রিসীমাতেও পৌঁছে না।

ইহার পর কয়েক মাস চলিয়া গেছে, বালিকাদের কুটী-রের নিকটে ভীলগ্রাম যাইবার রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্বাভাবিক নিকুঞ্জ মধ্যে বালিকা প্রায় রোজই বেড়াইতে আসে, আজও আসিয়াছে। পাহাড়ের একটি অংশ হইতে জল চুঁয়াইয়া এই নিভৃত স্থানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় হইয়াছে, বালিকা সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া বসিল, জলাশয়ের স্ফটিক জলে তাহার মুখখানি প্রতিবিম্বিত হইল। তাহার এলোচুলের রাশি মুখের আশে পাশে

পড়িয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া দিতেছিল, বালিকার কি মনে হইল কে জানে সে হাতে পাকাইয়া সেই ঘন চুলের রাশ এক রকম করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। অন্য সময় কেহ তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে আসিলে সে ভারী বিরক্ত হইত, মা যদি কোন দিন জোর করিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়া, কপালে একখানি আয়নার টিপ বসাইয়া, কাণে দুটি চাঁপা গুজিয়া সাজ সজ্জা করিয়া দিতেন, ত সমস্ত দিন সে মুখ গোমসা করিয়া বসিয়া থাকিত। সাজগোজে তাহার স্বাভাবিক কেমন বিতৃষ্ণা, ছেলেবেলা উলকি পরাইবার নাম করিলে সে মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত—সেই জন্য এতদিন তাঁহার উলকি পরা পয্যন্ত হয় নাই। তাহা হয় নাই বলিয়া তাহার বাড়ীর সকলের বিশেষতঃ তাহার মায়ের বড়ই দুঃখ, অমন সুন্দর রঙ্গে যদি উলকির ফলন না পড়িল তবে রংই মাটী ? কিন্তু আজ বালিকা চুল বাঁধিয়া মাটীর একটা টিপ গড়িয়া কপালে পরিল, দুইটা বাবলার ফুল তুলিয়া কাণে দিল—দিয়া জলে মুখ দেখিতে লাগিল—কি জানি দেখিতে দেখিতে কি মনে হইল—আপন মনে বলিল—

সুন্দরী ! ছি এই বুঝি সুন্দর ! বলিয়া টিপটা মুছিয়া বাবলা দুইটা খুলিয়া ফেলিল, চুলগুলি এলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া জলাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া খানিক পরে সে গুণ গুণ করিয়া গান আরম্ভ করিল,

ক্ষেতিয়ার কাছে গানটি শুনিয়া শুনিয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

সখিরে, ক্যায়সে বাজাওয়ে কান!
ও নহি রে গীত তান, মুঝ অনুমান!
বাঁশরীক হিয়া ভরি, নিঠুর কানাইয়া মরি
অনুখণ স্মৃতিখন হানয়িছে বাণ!
টুটয়িল সরম আকুলিল মরম
চূর চূর অন্তর প্রাণ!
ও ক্যায়সে নিরদয় কান!

অল্পে অল্পে সেই গানের গুণগুণানি স্পষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে সুর হইতে রেখাবে, রেখাব হইতে গান্ধারে, গান্ধার হইতে মধ্যমে, মধ্যম হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ধৈবতে, ধৈবত হইতে নিখাতে উঠিয়া পড়িয়া খেলিতে খেলিতে সেই পাপিয়া কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী স্তব্ধ অরণ্যের শিরায় শিরায় তরঙ্গিত হইয়া দিক বিদিক উথলিত করিয়া তুলিল, বালিকা আপন মনে শুধু গাহিতে লাগিল। সহসা সে চমকিয়া গান বন্ধ করিল, হঠাৎ মনে হইল—জলাশয়ে যেন কাহার ছায়া। ফিরিয়া দেখিল রাজা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। বালিকা বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল—বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা এখানে একাকী আসেন নাই, সঙ্গে গণপতি, গণপতি বলিলেন—"দূর হইতে মনে হইতেছিল—এ কোন

দেবকন্যার কণ্ঠধ্বনি স্বর্গ হইতে উচ্ছসিত হইতেছে। সত্য যে এখানে কেহ গাহিতেছে তাহা মনে হয় নাই"।

এই গীত ধ্বনিতেই কুতূহল হইয়া তাঁহারা এখানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই নির্জ্জন নিকুঞ্জে সেই সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি বনদেবীর মত তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল, হরিতাচার্য্যের কথা রাণীর কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি মনে মনে বলিলেন—"ভাল বাসিবার সামগ্রী বটে" আর কিছু নহে, শুধু বলিলেন—ভালবাসার সামগ্রী বটে। একথা তাঁহার এই প্রথম মনে হইল, তাহার সৌন্দর্য্য তিনি এই প্রথম অনুভব করিলেন। অনেক সময় মিথ্যা ক্রমে সত্য নির্ম্মাণ করে। সন্দেহ বিশ্বাসের মূল গঠিত করে। এরূপ কথা হয় ত বা রাজার মনেই আসিত না, যদি রাজা না জানিতেন যে ইহা অন্যের মনে আসিয়াছে।

এই সময় ক্ষেতিয়া কাঠের মোট মাথায় এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরণ্য হইতে বাড়ী যাইবার সময় বিকালে প্রায়ই সে এখান দিয়া হইয়া যাইত, কেন না সে জানিত সুহার বিকালে এখানে থাকে। আজ বালিকার নিকট রাজাকে বন মধ্যে দেখিয়া ক্ষেতিয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, তীব্র স্বরে সুহারকে বলিল, "সুহার বাড়ী যাউবি না?" অন্য সময় হইলে সুহার তাহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিত, কিন্তু আজ কে জানে কিছু বলিতে

সাহস করিল না—আস্তে আস্তে নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। রাজা তাহার পরও কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশ।

কথা আছে প্রণয়ী অন্ধ, যাহাকে ভালবাসে তাহাকে দেখিয়া ভাল বাসে না। কিন্তু প্রণয়ীর দিব্য চক্ষু ইহাই ঠিক। সহজে অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, প্রণয়ীর নিকট তাহা সুস্পষ্ট। রাজার নিকট ক্ষেতিয়া সুহারকে দেখিয়া বড়ই মুষড়িয়া গেল, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না—যে সুহার রাজাকে ভালবাসে। রাজা বালিকাকে যে কোন গুণ জ্ঞান করিয়াছেন তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না, নহিলে এত দেশ থাকিতে রাজার প্রতি তাহার মন পড়িবে কেন! ভীলের চক্ষে সেটা নিতান্তই একটা অসম্ভব ব্যাপার। বালিকা তাহার কথায় যতই বিরক্ত হউক না কেন, কালে তাহাকে যে বিবাহ করিবে এইরূপ তাহার একটা ধারণা ছিল—কিন্তু আজ সে দমিয়া গেল, বাড়ী গিয়া তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। সন্ধ্যার পর সে বাড়ী হইতে বাহির হইল, শিখরপাড় গ্রামের সেই ভীল গুণী ভীলগ্রামে এখন

বাস করেন, তাহার নিকট সে যাত্রা করিল। গুণী তাহাকে নানা রূপ প্রশ্ন করিয়া বালিকার সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে সব বাহির করিয়া লইয়া অবশেষে বলিলেন—“রাজা মেয়েরে গুণ করিয়াছে।” ক্ষেতিয়া তাহাতে একমত হইল। গুণী বলিল “জিনিষ জিনিষ—ফুল ফুল, রাজা একদিন মেয়েরে ফুল দিয়াছিল ?” ক্ষেতিয়া তাঁহার গণনায় বিস্ফারিত চক্ষু হইয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল, গুণী বলিলেন—‘সে ফুল গুণকরা ফুল তাহাতেই মেয়ে বশীভূত হইয়াছে’।

ক্ষেতিয়ার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। গুণী একটি শিকড় তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—“ইহা লও; সেই ঘাটে যে ফুল ভাসিয়া যাইবে সেই ফুলে তিনবার এই শিকড় বুলাইয়া তাহা কন্যাকে দিবে, একদিনে না হউক প্রত্যহ দিতে দিতে কন্যা বশীভূত হইবে, আর রাজা যে মায়া-ফুল কন্যাকে দিয়াছেন, তাহা কোথায় খুঁজিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে, গোপনে লইও যেন কন্যা না টের পায়।”

গুণীর আর কোন গুণ না থাক মনুষ্য চরিত্র যে কতক পরিমাণে তাহার আয়ত্ত ছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। ভালবাসা দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে একজন বশীভূত হইবে, এ উপদেশ সাধারণত বিফল না হইবারই কথা। তবে সকলস্থলে যে একই উপদেশ খাটেনা ইহাই মাত্র

তাঁহার বুঝিবার ভুল। যদি তিনি দেখিতেন বালিকা ভীল নহে—তাহা হইলে হয়ত এরূপ উপদেশ দিতেন না।

ভীল আহ্লাদিত চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল—সমস্ত রাত তাহার ঘুম হইল না, প্রাতঃকালে নদী তীরে গিয়া দেখিল পুরোহিত স্নান করিতেছেন—তিনি স্নান করিয়া উঠিয়া গেলেন, সে আস্তে আস্তে তাঁহার পূজার ফুলগুলি তুলিয়া লইল, তুলিয়া তাহা মন্ত্রপুতঃ করিল। বালিকা নিয়মিত সময়ে অন্য ঘাটে স্নানে আসিল, তাহার সঙ্গে আর একজন ভীলকন্যা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাহাকে দেখিয়া ক্ষেতিয়ার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে নিকটে গিয়া সেই ফুলগুলি ধরিল—বালিকা তাহার পানে চাহিল, নয়নে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল—ভীল বলিল—"তুইডার লাগিন আন্নুছি—তুইডা ফুল ভালবাস্থস ?"

বালিকা বলিল—"আমি ফুল ভালবাসি কে বলিল ? এখানেও বিরক্ত করিবি"—বলিয়া ফুল লইয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিল—কাল সে তাহাকে কিছুই বলিতে পারে নাই—আজ তাহার শোধ লইল। ক্ষেতিয়ার মনে বড় কষ্ট হইল, চোখে জল পড় পড় হইয়া আসিল, এমন সময় রাজা স্নান করিতে আসিলেন—বালিকা তাহার চোখের জল দেখিতে পাইল না। বালিকা জল হইতে উঠিয়া উপরে গাছের মধ্যে দাঁড়াইল, তাহাকে কেহ না দেখে সেই ষাংাতে দেখিতে পায়। ক্ষেতিয়া তাহা বুঝিল, নিরাশ চিত্তে সে সেইখানে

দাঁড়াইয়া রহিল—রাজা স্নান করিয়া চলিয়া গেলেন, সুহার কখন চলিয়া গেল, সে উঠিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের কাছ দিয়া ভীলগ্রামাভিমুখে চলিল—আবার সেই যাদুকরের কাছে যাইবে। পুরোহিত তাহাকে ডাকিলেন—তিনি দেখিয়াছিলেন তাহার ফুল বালিকা ছুঁড়িয়া উপরে উঠিল। ক্ষেতিয়া দাঁড়াইল, পুরোহিত দেখিলেন তাহার মুখে হৃদয়ের গভীর দুঃখ। জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষেতিয়া (পুরোহিত তাহাদের চিনিতেন) ও তোমার কে ?

ক্ষেতিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিল, খানিক পরে বলিল—"মোর কেউ না, মুইড়া বিয়া কর্‌তে চাউল।"—

কোথায় অসভ্য ভীল, কোথায় সুন্দরী মোহিনী যুবতী, তাহার এরূপ আকাঙ্ক্ষায় অন্য লোকের হাসি আসিত। কিন্তু পুরোহিত তাহার এই দুর্লভ বাসনায় দুঃখিত হইলেন মাত্র ; বলিলেন—"বৎস, কন্যা তোমাকে বিবাহ করিতে চাহে না বুঝি ?"

ভীল বলিল—'না'

তিনি বলিলেন "দেখ বৎস যদি চাঁদকে চাহিয়া না পাও ত তোমার দুঃখ হইবে ? এ বৃথা দুঃখ, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই অন্যায়"।

ভীল বলিল, "মোরে কি বিয়া করুত না ! রাজাডাই সর্ব্বনাশ করুল ! রাজাডা ওরে গুণ করুছে।"

ভীলের মুখ রক্তবর্ণ হইল—পুরোহিত বলিলেন—"কি ?"

সে বলিল "রাজাডা তুই—তুইডা ভীলের মেয়েরে কেন চাউস ? মন্তর-ফুল দিউস—বনের মধ্যে ঢুঁরিয়া ফিরুস ?"

পুরোহিত বলিলেন—"বনের মধ্যে !"

ক্ষেতিয়া বলিল "হ্যাঁ বনের মধ্যে ! কাল দেখিনু দুজনে বনের মধ্যে ?

"দুজনে বনের মধ্যে ?"

"হ্যাঁ দুজনে। রাজা আর পুরাণ পুরুত ঠাকুর ?"

"পুরাণ পুরুত ঠাকুর !"

"ঠাকুর, রাজারে বলুস্ তুইডা, মেয়েরে যদি না ছাড়ুবে ত ভাল হউবে না, মোদের ধনে রাজার দৃষ্টি—মোরা কুথায় দাঁড়াই গিয়ে।"

পুরুত ঠাকুর তাহার শাসনের কথা কানে শুনিলেন না—যাহা শুনিলেন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া আসিল। ক্ষেতিয়া চলিয়া গেল, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কেবল ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বুঝিলেন রাজাকে সেই দিন যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আর কিছু বলিলেও যে ফল হইবে এমনো মনে হইল না। তবে ইহার প্রতিকার কোথা ? তিনি ব্যথিত হইলেন, উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল রাণী যদি রাজাকে রক্ষা করিতে পারেন ত তাহাই একমাত্র উপায়। তিনি তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে কথা কহিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিছু পরে গণপতি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, গণপতি

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া না দাঁড়াইতেই তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"গণপতি!" গণপতি চমকিয়া উঠিলেন, হরিতাচার্য্য বলিলেন "ইতি মধ্যে রাজাকে ভীলকন্যার সহিত বনে দেখা গিয়াছিল"?—

হরিতাচার্য্যের সেই ক্রুদ্ধ স্বরে গণপতি এতদূর ভীত হইলেন যে তাঁহার মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইল না। হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আর তুমি তাঁহার সহিত ছিলে অথচ তাঁহাকে একটি কথা কহ নাই! এই তোমার পৌরোহিত্য"?

গণপতি অর্দ্ধোচ্চারিত ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন—"দেব, কিন্তু—আমি—কিন্তু—রাজা—"

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আর কিন্তু না, তুমি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নহ—আজ হইতে তোমাকে আমি বিদায় দিলাম"।

বলিয়া পুরোহিত মন্দিরের বাহির হইয়া গেলেন। নিরপরাধ গণপতি স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ।

ভীলের মেয়ের সহিত রাজাকে একত্র দেখা গিয়াছে, সে কথা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না, কথাটা রাজবাটীতেও উঠিল, সখীদিগের মধ্যে তাহা লইয়া মহা একটা কাণা-কাণি ঘুসাঘুসি চলিতে লাগিল, রাণীর দুঃখে কেহই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে বাকী রাখিলেন না, কেবল যাঁহার দুঃখ তিনিই একথা জানিলেন না, সকলেই তাঁহার কাছে কথাটা প্রকাশের জন্য অস্থির,—অথচ কেহই বলিতে সাহস করে না। অবশেষে কোন রকমে তাঁহার কাণেও উঠিল। রুক্মিণী দাসী রাণীর বড়ই প্রিয়, সে তাঁহার বাপের বাড়ীর দাসা, তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে আবার তাঁহার ছেলেকেও মানুষ করিতেছে। সে এ কথা শুনিয়া কোন মতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। একদিন দুপর বেলা শয়ন কক্ষে পালঙ্কে বসিয়া রাণী সেতার বাজাইতেছেন সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। রাণী তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া বুঝিলেন তাহার কিছু একটা বলিবার আছে। সেতার রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি রে রুক্মা?”

সে বলিল “একি শুনতে পাই, রাজা যে ভীলের মেয়ের রূপে মুগ্ধ?”

আবার সেই কথা!

রাণী রাগিয়া বলিলেন—"কে এসব কথা উঠায় বল দেখি" ?

দাসী বলিল—"ওঠাবে আর কে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে" !

রাণী আরো রাগিয়া গেলেন, বলিলেন "দেখ্ যদি অমন করে বলবি, তোকে এখনি ছাড়িয়ে দেব"

দাসী বলিল "তা ছাড়াবে না কেন ? আজ তোমার স্বামী পুত্র হয়েছে, আজ আমি দাসী বই আর কি ? যখন কোলে করে মানুষ করেছিলুম তখন আমি দাসী ভেবে করি নি"

রাণী অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন "অন্যেরা যা বলে বলুক ওসব কথা তুই বলিস কেন" ?

দাসী বলিল "আরে অবোধ মেয়ে, আমি কি সাধে বলি ! তোর ভালর জন্যই বলছি। রাজার মন যাতে ভাল হয় এখন থেকে তার উপায় কর, ওষুধ বিষুধ চেষ্টা কর, নইলে পেকে দাঁড়ালে কি আর সামলাতে পারবি। তুই যদি না কিছু করিস ত আমি পুরুত ঠাকুরকে গিয়ে বলব এর একটা তন্ত্র মন্ত্র না করলে চলবে না"

রাণী কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল "পুরুতঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, বারান্দায় আসন দিয়া তাঁহাকে বসাইয়াছি।"

দাসী খবর দিয়া চলিয়া গেল, সেমন্তী রুক্মাকে বলিলেন—"দেখ তুই যদি পুরুত ঠাকুরকে কি আর কাউকে এ সব কথা বলে বেড়াবি—ত তক্ষণি আমি তোকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব, খবরদার এ কথা নিয়ে ঘোঁট করে বেড়াস নে।"

দাসী যদিও বুঝিল রাণীর কথাটা নিতান্তই ভয় দেখান কথা নহে—তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিলে সত্যই তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন না, তবুও পুরুতঠাকুরের নিকট এ কথা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিতে পারিল না, তবে কথাটা গোপনে বলিবে ঠিক করিয়া রাখিল।

রাণী পুরোহিতের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলে পুরোহিত বলিলেন "বৎসে মঙ্গল হোক, বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—"বিষণ্ণ?- না বিষণ্ণ না, রাগ ধরেছিল, দাসীগুলোর বাজে কথায় মানুষ কি রাগ না করে থাকতে পারে?

পুরোহিত একটু হাসিয়া বলিলেন—"মা-আমার বাজে কথা শুনিতে পারেন না, আমি কিন্তু একটু বিশেষ কাজের কথায় আসিয়াছি, শুনিবার এখন অবসর হইবে কি?"

রাণী একটু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন—"আপনার কথা শুনিব তাহার আবার অবসর! দেখুন দেখি আপনি কি বলেন! সকল সময়েই তাহা শিরোধার্য্য;"

রাণী উৎসুক হইয়া চাহিলেন, পুরোহিত গলাটা পরিস্কার করিয়া লইতে যেন একটু থামিলেন, আসল কথা, যেরূপ সহজে সে কথা বলিলেন ভাবিয়াছিলেন দেখিলেন বলাটা তত সহজ নহে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"মা, স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিনী, স্বামীকে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে রক্ষা করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, সেদিকে যেন তোমার লক্ষ্য থাকে।"

রাণী বিস্মিত হইলেন। এই তাঁহার বিশেষ কথা! ইহা কি আর রাণী জানেন না? এই কথাগুলির মধ্য দিয়া পুরোহিতও কি তবে সেই কথাই তাঁহাকে বলিতেছেন? রাণীর প্রাণে বেদনা লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন—"নাগাদিত্যের প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি দেখিতেছি, রাজা যদি সাবধানে না চলেন—ত তাঁহার অমঙ্গল রাজ্যের অমঙ্গল সন্নিকট"—

রাণী চমকিয়া উঠিলেন, আর সব কষ্ট তিনি ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন—"কুগ্রহ! প্রভু কিরূপে তাহার শান্তি হইবে!"

পুরোহিত বলিলেন—"বৎসে ভয় পাইও না, তাঁহাকে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত কর, তাঁহার সমস্ত বিপদ দূর হইবে।"

রাণী চুপ করিয়া রহিলেন,—কিছু পরে বলিলেন—"দেব, আমি অবলা, সামান্য স্ত্রীলোক, আমার কি সাধ্য

আমি তাঁহাকে পরিচালিত করি—আপনি এ কথা তাঁহাকে বলুন, তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিন।"

পু। "না বৎসে, তাঁহাকে এ কথা কিছু বলিও না, যাহার গ্রহ তাহাকে তাহা জানান বৃথা, তাহাতে বিপরীত ফল ঘটে, মনের মধ্যে আশঙ্কা জন্মাইয়া দিলে সেই আশ-ঙ্কায় গ্রহের দৃষ্টি আরো প্রখর হয়, ভবিতব্য তাহাতে আরো অগ্রসর হইয়া আসে, তাহা ছাড়া আর কিছু ফল হয় না। মা তুমি আপনাকে সামান্য ভাবিও না, স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তোমার এ শুভ ইচ্ছা সাধনে ভগবান তোমাকে বল দিবেন।"

বলিয়া পুরোহিত উঠিবার উদ্যোগ করিলেন—রাণী বলিলেন "দেব আমাকে বলিয়া দিন আমি কি করিব,—আমার সব অন্ধকার মনে হইতেছে?"

পুরোহিত বলিলেন—"তুমি তাঁহাকে সত্যের পথে চালিত করিবে, প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে, বুঝিলে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে। কিন্তু কি করিয়া তাহা করিবে তাহা আমি জানি না, আমা অপেক্ষা তুমি বৎসে তাহা ভাল বুঝিবে।"

পুরোহিত বিদায় লইলেন, রাণী ভাবিতে লাগিলেন। পুরোহিতের শেষ কথায় তাঁহার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইয়া-ছিল—রাজার গ্রহ কি, কাহা হইতে পুরোহিত অনর্থ উৎপত্তির ভয় করিতেছেন তাহা মহিষী বুঝিলেন, রাণী

ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, সকলেই এই এক কথা বলি-তেছে!

কিন্তু মনের ব্যথা তাঁহার মনেই রহিল। পাছে মনের ব্যথা বাহিরে প্রকাশ পায়, পাছে কেহ মনে করে রাজার প্রতি তিনি সন্দেহ করিয়াছেন—প্রাণের অশ্রু প্রাণে রাখিয়া তিনি সখীদের সহিত রীতিমত হাসিয়া কথা বার্ত্তা কহিলেন—নিয়মিত সাজসজ্জা করিয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজাও প্রতিদিনের মত উদ্যানে আগমন করিলেন। বাগানে ফোয়ারা ছুটিতেছে, গাছে গাছে দীপ জ্বলিতেছে, রাণীর সম্মুখে সখীদের নৃত্যগীত চলিতেছে। রাণী প্রস্ফুটিত ফুলবৃক্ষ বেষ্টিত প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায়, আশে পাশের ফুলের মধ্যে ফুল-রাণীর মতই শুইয়া আছেন, এক একটি ফুল দুলিতে দুলিতে তাঁহাকে স্পর্শ করি-তেছে। রাজা আসিবার পরও খানিকটা নৃত্যগীত চলিল, তাহার পর তাহারা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে রঙ্গ ভূমির অভিনেত্রীদিগের মত একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ক্রমে বৃক্ষ নিকুঞ্জের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া সেখানে গান বাদ্য করিতে লাগিল, সেখান হইতে মধুর গীত ধ্বনি কোমলতর মধুরতর হইয়া রাজা রাণীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

সখীরা যখন চলিয়া গেল—রাণীর এতক্ষণকার উথলিত

আবেগ তখন আর বাঁধ মানিলনা, রাজার কোলে মাথা রাখিয়া রাণী কাঁদিতে লাগিলেন, কি করিয়া রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন রাজা যেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে"? বারবার বলিতে লাগিলেন, "আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" তাঁহার উচ্ছসিত-প্রেমাদরে রাণীর ব্যথা শমিত হইতে লাগিল; হৃদয় দিয়া তাঁহার হৃদয়ের অশ্রু মুছাইতে রাজা প্রয়াসী হইলেন। রাণী যখন দেখিলেন তাঁহার ক্রন্দনে রাজা কতখানি আকুল, সেই আকুলতার মধ্যে কত ভালবাসা, কত মমতা, কত সান্ত্বনা মাখামাখি, তখন রাণীর মনের অন্ধকার ক্রমে একটা আনন্দের আলোকের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

রাণীর বড় বড় চোখের পাতা তখনো অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, —ছোট ছোট ঠোঁট দুখানি তখনো এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল, মুখের বিষণ্ণতা হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে আরো গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ অশ্রুজলে এ গাম্ভীর্য্যে কতখানি মাধুর্য্য কতখানি আনন্দ প্রকাশ পাইতেছিল! রাত্রের অন্ধকার দূর হইলে প্রথম প্রভাতের যে গাম্ভীর্য্য, গভীর তৃপ্তিতে যে অবসাদ, রাণীর ছোট্ট সেঁউতি ফুলেরই মত মধুর বিষণ্ণ শুভ্রমুখে রাজা সেই আনন্দের বিষাদ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ও উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল, সোহাগভরে কহিলেন—"সেঁউতি রাণি বিষণ্ণ হই-য়াই কি তুই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চাস ?"

রাণী রাজার দিকে চাহিয়া একটু অভিমানের স্বরে বলিলেন—"এসব কথা কেন উঠে ? আমি শুনিতে পারি না।"

রাজা বুঝিলেন কি কথা, হাসিয়া বলিলেন—"কেন ওঠে আমিও তাই জিজ্ঞাসা করি ?"

রাণী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া—বড় বড় চোখে একটু তিরস্কারের ভাব পূরিয়া বলিলেন—"কিন্তু সমস্তটাই কি লোকের দোষ ? সত্য কি কিছুই নাই ?"

রাজা আশ্চর্য্য হইলেন, তিনিও তিরস্কারচ্ছলে বলি-লেন—"মহিষি ?"

মহিষী একটু থতমত খাইয়া, একটু গম্ভীর হইয়া বলি-লেন—"না মহারাজ আমি ও কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি—সব বিষয়ে লোককে উপেক্ষা করিলে কি চলে ? রাজা হইয়া তুমি ভীলের সহিত মেশ, বন্ধুর ব্যবহার কর, লোকেরা কেনই বা না নিন্দা করিবে ?"

রাজাও তখন একটু গম্ভীর হইলেন, বলিলেন—"রাজা হইয়াছি বলিয়া আমিত লোকের দাস হই নাই, আমার মান অপমান আমি নিজে বুঝি, তাহাদের কথায় তাহার মীমাংসা নহে। ধনে যাহারা বড় তাহাদের আমি প্রকৃত বড় লোক বিবেচনা করি না—গুণেই মানুষ বড়লোক।

জুমিয়া আমার সভাসদ হইতেও আসলে বড়! ছোট লোকের সহিত আমি বন্ধুত্ব করি নাই।”

মহিষী অধোমুখ হইলেন, বুঝিলেন রাজা ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু হরিতাচার্য্যের কথা তাঁহার মনে জাগিতেছিল, তাই তবু বলিলেন—“তবে লোকের কথা আর মিথ্যা হইতেছে কই? ভীল যে সত্যই তোমার এত বন্ধু তাহা ত আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম তাহারা বাড়াইয়া বলে। একটা সত্য হইলে আর একটাও সত্য হইতে পারে”।

রাজা বলিলেন—“মহিষি তুমি আমার নিকট আজ প্রহেলিকা, এ তোমার হৃদয়ের কথা না মুখের?”

মহিষী বলিলেন—“কি মনে হয়?

রাজা। “কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আগে কখনো তোমাকে এরূপ করিয়া বলিতে শুনি নাই,—তাই সমস্তটাই একটা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইতেছে।”

মহিষী বলিলেন—“তবে আর প্রহেলিকায় কাজ নাই। মহারাজ, লোকে তোমার নামে মিথ্যা বলে আমার বড় কষ্ট হয়, তাহারা বলিতেছে ভীলের মেয়ের সঙ্গে তোমাকে বনে একত্র দেখিয়াছে—এনিন্দা’——

রাণীকে আর কথা কহিতে না দিয়া রাজা একটু অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন—“মহিষি! তোমাকে আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সত্যই একদিন ভীলের মেয়ের সঙ্গে বনে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল—কিন্তু কি ভয়ানক মিথ্যা নিন্দা।”

রাজা সংক্ষেপে সেদিনকার ঘটনা বলিলেন—রাণী প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেন,—হঠাৎ যেন কেমন ব্যথিত হইলেন,—কিন্তু সে ব্যথা ঠিক অবিশ্বাসের ব্যথা নহে একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার ব্যথা। দাসীদের কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—"লোকে যাহাই বলুক, তাহাতে আমার মনে এ পর্যান্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ শুনিতে শুনিতে পাছে তোমাকে কখনো সন্দেহ করিয়া ফেলি বড় ভয় হয়। মহারাজ, তুমি তাঁহার পথ দূর কর, আমাকে অঙ্গীকার দাও ভীলের মেয়ের মুখ আর তুমি দেখিবে না।"

রাণী যাহা বলিলেন—হৃদয়ের সরল কথা বলিলেন, কিন্তু এই কথায় হঠাৎ রাজা কেমন রাগিয়া গেলেন, বলিলেন—"লোকের কথায় যদি তোমার আমার উপর হইতে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায় ত সে বিশ্বাস আমি শপথে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি না, স্বতঃ উৎসারিত বিশ্বাস ভিন্ন অন্যরূপ বিশ্বাসের আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

রাজার মনে হইল—এ সমস্তই পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, তিনি এখানে আসিয়াছিলেন তাহাও জানিতেন। তাঁহার কথায় রাণী এতদূর নীত হইয়াছেন রাজার তাহা বড়ই খারাপ লাগিল, রাজা গুম হইয়া রহিলেন। রাজার সেই রুদ্ধ ভাবে রুদ্ধ ব্যবহারে রাণীর বিষম আঘাত লাগিল, তিনি কি এমন অন্যায় কথা বলিয়াছেন যে রাজা তাঁহার

প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। রাণী এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন, যে তাঁহার অশ্রুজল বাহির হইল না, স্তম্ভিত বিষাদের ন্যায় তিনি বসিয়া রহিলেন। রাণীর রুদ্ধ যন্ত্রণা রাজা অনুভব করিলেন, কিন্তু তথাপি একটি কথা কহিলেন না, আর কখনো যাহা করেন নাই—সেই বিষণ্ণ কাতর মর্ম্মপীড়িত পত্নীর সমুখে বসিয়া নীরব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাছের ভিতর দিয়া সন্ধ্যাতারা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, গাছের আড়াল হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত আকাশে ভাসিয়া উঠিল, জ্যোৎস্নালোকে ফুল-গাছের ছায়া চাঁদের বিষাদের ছায়ার মতই যেন বিছানার উপর পড়িল—রাজা একটু পরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, মহিষী সেই ছায়ায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা এই প্রথম, তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম মনোবিচ্ছেদ। কে যেন বলিতে লাগিল "তোমাদের এ চির বিচ্ছেদ, এ বিচ্ছেদ আর কখনো দূর হইবে না।" রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া মনের ভিতর মন দিয়া দেখিলেন তিনি কি রাজাকে সন্দেহ করিতেছেন? দেখিলেন রাজাকে তাঁহার সন্দেহ নাই,—তবে কেন এরূপ সন্দেহ ভাবের কথা কহিয়া রাজাকে কষ্ট দিয়াছেন? এ ঘটনার জন্য তিনিই কি সম্পূর্ণ দোষী নহেন? আবার পুরোহিতের সেই কথা মনে আসিল—

রাজার অমঙ্গল—রাজ্যের অমঙ্গল—রাজাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখাই রাণীর কর্ত্তব্য”—রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কি করিতেছেন, কি করিবেন—সমস্তই যেন অন্ধকার সংশয়ের মধ্যে নিহিত, তিনি সেই আঁধার সমুদ্রের আঁধার তরঙ্গের মধ্যে আত্মহারা, ইহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন কে একজন যেন কাছে আসিতেছে। রুক্মা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন “রুক্মা একবার মহারাজকে ডাকিয়া আন।” তাঁহার ভাব দেখিয়া রুক্মার চোখে জল আসিল, সে কথাটি না কহিয়া মহারাজকে ডাকিতে গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিকুঞ্জ পথ।

সন্দেহ সন্দেহ! কেবলি সন্দেহ! রাজা বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুরের বাহির হইলেন, রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পাশ দিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন; তোরণ অতিক্রম করিবার সময়ে প্রহরী বলিল “মহারাজ গণপতি ঠাকুর সাক্ষাৎ প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন।”

রাজা বিরক্ত ভাবে উত্তর করিয়া গেলেন—“কেহ এখন আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। কেহ যেন আমাকে খুঁজিতে না

যায়।" নদীর ধারে তিনি একটি গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, স্থহারমতীর জ্যোৎস্নালোক-দীপ্ত সফেন তরঙ্গ তাঁহার চোখের উপর উথলিত হইতে লাগিল; নিস্তব্ধ রাত্রে তীরের অন্ধকার গাছপালা—নদীর জ্যোৎস্নাধৌত কালজলে নীলাকাশ—সমস্তই যেন একটা স্বপ্ন রাজ্যের বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের ক্রদ্ধ আলোড়িত ভাবের সহিত এই নিস্তব্ধ জগতের কি প্রভেদ ভাব! ধীরে ধীরে রাজার হৃদয় প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে স্থষুপ্তির মত তাঁহার হৃদয় জ্যোৎস্না-দৃশ্যের স্তব্ধতায় লীন হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে রাজার মনে প্রথম দিনের এই নদী তীরের ঘটনাটি জাগিয়া উঠিল। বাস্তবিক কি স্থন্দরী! পদ্মও সে হাতে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল! সে দিন রাজা প্রশংসার মত যে কথা কথার-কথা ভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আজ যেন অনুভব করিয়া বলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে রাজা তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, একেবারে জলের ধারে নামিয়া হঠাৎ একটু হঠিয়া দাঁড়াইলেন, অদূরে নদীর উপরে একটি গাছের তলায় কে যেন বসিয়া। রাজাকে দেখিয়া মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল,—নিকটে আগমন করিল, রাজা বলিলেন—"আপনি গণপতি ঠাকুর! এখানে একাকী"?

গণপতি ঠাকুর বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—"মহারাজ আমার আর স্থান কোথা?"

মহারাজ গণপতিকে গুরুর মত ভক্তি না করুন, কিন্তু তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, তাঁহার সেই বিষণ্ণ ভাবে নৈরাশ্য-পূর্ণ কথায় ব্যথিত হইলেন—বিস্মিতও হইলেন, বলিলেন, "কি হইয়াছে ?"

গণপতি বলিলেন "হরিতাচার্য্য আমাকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, আমি আর এখানকার কেহই নই।"

রাজার অপ্রকৃতিস্থ হৃদয় অতি অল্পে আলোড়িত হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"কেন ?"

গণপতি মৌণ হইয়া রহিলেন। রাজা বলিলেন "শুধু শুধু আপনাকে তাড়াইতে তাঁহার কি অধিকার। আপনি কি দোষ করিয়াছেন ?"

গণপতি বলিলেন—"আর কিছু দোষ নহে—দোষ আপনি আমাকে ভাল বাসেন—আমি আপনাকে ভাল বাসি" !

রাজা অধীর হইয়া বলিলেন—"ভাল করিয়া বলুন কি হইয়াছে; আমি আপনাকে ভালবাসি তাঁহার তাহাতে কি?"

গণপতি বলিলেন—"তিনি চান আমি তাঁহার গুপ্তচর হইয়া আপনার প্রতিদিনকার কথা তাঁহাকে খবর দিই—তিনি চান আপনার প্রতিকার্য্যে তাঁহার মত সন্দেহ করিয়া আপনার জীবন অসহ্য করিয়া তুলি। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে আপনি ভীল কন্যার প্রেমে মুগ্ধ, আমি তাঁহার কথায় সায় দিই নাই—আমার এই অপরাধ"।

রাজার অসীম ক্রোধ হইল, খানিক পরে তিনি বলিলেন—"তিনি যেমন মন্দির স্বামী তেমনি থাকুন—আমি আর একটি মন্দির স্থাপন করিব, আপনি তাহার পুরোহিত হইবেন,—আমি আপনাকে কুল পুরোহিতরূপে বরণ করিব।"

পুরোহিত আশাতীত আহ্লাদে বাক্যহীন হইলেন।

রাজা বলিলেন—"এখন আসুন আমার সহিত"। রাজা চলিতে লাগিলেন—গণপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুজনেই নিস্তব্ধ, স্তব্ধ নিশীথের দুইখানি মেঘের ছায়ার মত ধীরে ধীরে যেন দুজনে ভাসিয়া চলিয়াছেন। দুজনেই চিন্তা মগ্ন, দুজনেই নিজের ভাবে অন্যমনা। গণপতি আনন্দের চিন্তায় মুমূর্ষু, ক্রোধ ও বিরক্তির ভাবে রাজা প্রপীড়িত, তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতেছে—"কেবলি সন্দেহ কেবলি অবিশ্বাস! আমি কি করিয়াছি?"

দূর শৃঙ্গপরে নীলাকাশে মস্ত চাঁদ, শাল গাম্ভারী প্রভৃতি বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়া রাস্তার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার গায়ের উপর গাছের ছায়া লতাইয়া আছে, ছায়ার গায়ে জ্যোস্নার গায়ে তৃণ-গুল্মরাশি, বনফুলের রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। সহসা রাজা দেখিলেন—এ সেই তরুপথ, এই খানে বেড়াইতে বেড়াইতে অদূর-নিকুঞ্জের সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন, আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই সেই নিকুঞ্জের ভিতর গিয়া পড়িবেন। সেই সুধা লহরী ধ্বনি রাজার কাণে যেন

বাজিয়া উঠিল,—সহসা রাজা চমকিয়া উঠিলেন, নিজের প্রতি নিজের যেন সহসা সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন—"এ কোথায় আসিয়াছি!" বলিয়াই তিনি ফিরিলেন, তাঁহার মনে হইল, গাছ পালার মধ্যে কে যেন বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল, সচকিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—কেহই কোথায় নাই,—রাজা দ্রুত পদে বন পার হইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই শুনিলেন মহিষী তাঁহাকে ডাকিয়াছেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ।

রুক্মা বাহিরবাটীতে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ কোথায়?" প্রহরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল? "বেড়াইতে গিয়াছেন?"

রুক্মা বলিল—"এত রাত্রে—বেড়াইতে গিয়াছেন! যাও সংবাদ দাও—মহারাণী ডাকিতেছেন।"

প্রহরী বলিল—"মহারাণী ডাকিতেছেন—কিন্তু—

রুক্মা রাগিয়া গেল, বলিল—"কিন্তু কি রে হনুমান? তোর দেখছি বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে?"

প্রহরী মুস্কিলে পড়িল, বলিল—"কিন্তু—কিন্তু মহারাজ যে যেতে বারণ করেছেন?"

রুক্মা। "মহারাজ যেতে বারণ করেছেন?"

প্রহরী বলিল—"হাঁ। আমি ঠিক বলছি রুক্মা—মহারাজ নদীর ধারের দিকে বেড়াতে গেলেন, আর আমাকে হুকুম দিয়ে গেলেন—কেহ যেন তাঁকে খুঁজতে না যায়—রাণী-জিকে বলিও—এ দাসের কোন কসুর নেই।"

রুক্মা বলিল—"বটে, তবে তুই থাক" বলিয়া দ্রুত বেগে সে দ্বার নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রহরীর কথায় তাহার মনে মহা সন্দেহ জন্মিল। রাজা বাহিরে গিয়াছেন—এত রাতে,—তা আবার অন্য কাহাকেও নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন! মনে মনে ভাবিল 'হা রে বোকা মেয়ে কিছুতেই তুই বুঝিবি নে? কেবল আমাদের উপর রাগ করিবি—আর ঘরে বসিয়া কাঁদিবি? তবু একটা উপায় করিবিনে? পোড়ারমুখীকে দেশ ছাড়া না করিলে কোন দিন সে যে পাটরাণী হইয়া বসিবে?"

রুক্মা নদী তীরে আসিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল, কোন পথ অবলম্বন করিলে সে রাজার খোঁজ পাইবে—ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, তীরাভিমুখেই নামিতে লাগিল। হঠাৎ একবার থমকিয়া দাড়াইল, দূরের বৃক্ষতলে যেন দুইটী মনুষ্য ছায়া!

রুক্মা একটু ঘুরিয়া একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল, গাছের ভিতর দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্নালোক আসিয়া রাজার মুখে পড়িয়াছিল—রুক্মা রাজাকে চিনিতে পারিল,

কিন্তু আর একজনকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। একটি গাছের ডালের আড়ালে তাহাকে অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, একেবারে তাঁহাদের সম্মুখে না গেলে তাহাকে আর ভাল করিয়া দেখিবার যো নাই, কিন্তু রুক্মা তাহার আবশ্যকই বিবেচনা করিল না; যখন দেখিল এ দুইজনের একজন রাজা তখন আর এক জন যে কে তাহাতে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। ইহার পর সে শপথ করিয়া বলিতে পারিত—যে নিজে স্বচক্ষে মহারাজের সহিত একত্রে নির্জ্জনে নদীতীরে গাছেরতলায় ভীলকন্যাকে দেখিয়াছে। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে রাগে কষ্টে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে কিছু মাত্র আহ্লাদও যে ছিল না তাহা নহে, আহ্লাদটা অহঙ্কারের আহ্লাদ, চোরের উপর চুরী করিয়াছে, এই আহ্লাদ।

ইহারপর মুহূর্ত্ত মাত্র না দাঁড়াইয়া সে ধীরে ধীরে আবার অলক্ষ্যে উপরে উঠিল, উঠিয়া দ্রুতপদে রাণীর নিকট উপস্থিত হইল।

রাণী আর তখন প্রমোদ উদ্যানে নাই, তাঁহার শয়ন কক্ষে। বাপ্পার ক্রন্দনে কিছু পূর্ব্বেই তিনি প্রাসাদে আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। উপরে আসিয়া তিনি যখন বাপ্পাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাঁহার চুম্বনে শিশু যখন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া বার বার মা মা

করিয়া ডাকিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট দুই হাতে মায়ের মুখ খানি ধরিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল তখন রাণীর কষ্টের হৃদয়ে একটি পবিত্র সান্ত্বনা স্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। বালক তাঁহাকে আদর করিতে করিতে তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িল, রাণী ঘুমন্ত শিশুকে কোলের কাছে লইয়া বিছানায় শয়ন করিলেন, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সে হাসিয়া উঠিতে লাগিল, দু একবার মা মা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মায়ের চুম্বন স্পর্শ পাইয়া আবার নিশ্চিন্ত নীরব হইয়া গেল। রাণী তাহার ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার এই ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলেন, এই অনুভবে সন্ধ্যাবেলার দুঃখ বহুদিনের বিস্মৃত কষ্টের মত প্রশান্ত হইয়া আসিল, তাঁহার হৃদয়ে রাজার প্রতি অভিমানের আর তখন স্থান রহিল না, যতই তিনি সন্তানের প্রতি স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, যতই তিনি তাহার ভালবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন, যতই সে মুখে রাজার আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় সেই স্নেহ হইতে রাজার স্নেহে লীন হইতে লাগিল, রাজা যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি তখন একেবারে ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় অভিমান-শূন্য হইল, তাঁহার প্রেম তাঁহার ভালবাসাই তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন ;—

আর ভাবিতে লাগিলেন "ছি ছি আমি কি করিয়াছি—মিছামিছি তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি—তিনি হয়ত ভাবিয়াছেন—আমি তাঁহাকে সন্দেহ করি, কেন আমি এমন কাজ করিলাম।" রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রেম প্রকাশের উৎসাহে এতক্ষণকার দুঃখ তাপ মগ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় রুক্মা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী বলিলেন—"মহারাজ কোথা?" রুক্মার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে মনে মনে যাহা ভাবিতেছিল মুখেও তাহাই বলিল, বলিল—"আরে অবোধ মেয়ে—এখনো বুঝিবি নে? পোড়ামুখীটা যে পাটরাণী হইয়া বসিবে? রাজা তাহার কাছে—এই আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি।"

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না, জগৎ সংসার কেবল তাঁহার চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল, তিনি শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, ধরিয়া একটা ঘূর্ণঝটিকার সহিত যুঝাযুঝি করিতে লাগিলেন। রুক্মা তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ নানারূপ উপদেশ দিতে দিতে খানিকটা কান্না কাটি করিল, অবশেষে মহারাজকে আসিতে দেখিয়া চলিয়া গেল।

রাজা যখন ধীরে ধীরে পালঙ্কে আসিয়া বসিলেন,

তখনো রাণী জাগিয়া। কিন্তু নিদ্রিতের মতই নিস্তব্ধ ভাবে শুইয়া রহিলেন। রাজা দেখিলেন, রাণী ঘুমাইয়া। গৃহ এমন উজ্জ্বল দীপালোকিত নহে, যে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সেই অস্পষ্ট মলিন আলোকে তাঁহার ঘুমন্ত মুখে একটি অতি ম্লান সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইয়াছে। প্রশান্ত ললাট কি যেন একটি কষ্টের ছায়ায় রেখাযুক্ত, মুদিত কোরক সদৃশ নয়ন-পুট যেন অশ্রুভারে অবসন্ন হইয়াই মুদিত, ওষ্ঠাধর কি যেন করুণ ভাবে ঈষৎ বিকম্পিত। রাজা বুঝিলেন, তিনি কি অন্যায় করিয়াছেন, এই কুসুম-কোমল হৃদয়ের প্রতি কি করিয়া তখন অত কঠোর আঘাত দিয়াছিলেন, নিজেই যেন বুঝিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কেমন যেন তাঁহার নিজেকে দোষী বলিয়া মনে হইতে লাগিল, গুরুতর দোষী মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন প্রতারক, কি প্রতারণা করিয়াছেন—তাহা তিনি জানেন না, জানিতে সাহসও নাই, তবু যেন প্রতারক। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার মনে হইল সে পবিত্র মুখ স্পর্শ করিতে যেন তাঁহার অধিকার নাই, তিনি শুধু একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি এত স্থির হইয়া পড়িল যে রাণী যে নয়ন খুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেছেন—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি শুধু চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার স্থির দৃষ্টিতে ক্রমে সে মুখ

আর একরূপ হইয়া পড়িল, ক্রমে যেন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, এ কাহার মুখ? আকাশের মত নীলের মধ্যে কাল চ'খের তারা এ কার? স্বচ্ছ বিষণ্ণ মুখের মধ্যে কাহার এ মুখের ছায়া? সেমন্তী সেমন্তী তুমি কে? তুমি কি?—রাজা ধীরে ধীরে সেই চক্ষে চুম্বন করিলেন,—রাণীর স্তম্ভিত অশ্রু-রাশি সহসা উথলিয়া উঠিল, রাজা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমাকে ডাকিয়াছিলে?"

রাণী কথা কহিলেন না, তখন যে ভাবে ডাকিয়াছিলেন, এখন আর সে ভাব নাই। অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়া মার্জ্জনা চাহিবার জন্য তখন ডাকিয়াছিলেন—কিন্তু এখন কে অপরাধী? রাজাকে যখন ভীলকন্যার মুখ দেখিতে বারণ করিয়াছিলেন—তখন সন্দেহ করিয়া সে প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু এখন? এখন অভিমান সোহাগের অভিমান নহে, এখন সন্দেহের অভিমানে তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাকিয়াছিলে?"

রাণী গর্ব্বিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তখন জানিতাম না কোথায় ছিলে?"

রাজা বলিলেন—"কোথায় ছিলাম?"

রাণী। "যেখানে ভাল লাগে"

রাজা। "নিজেইত জানি না কোথায় ভাল লাগে ?"

রাণী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"কেন ভীল কন্যা"—এতক্ষণ রাজার হৃদয়ে যে একটা দোষের ভাব—অনুতাপের ভাব জাগিয়া উটিয়াছিল—রাণীর এই কথায় তাহা দূর হইল। এই সন্দেহে, এই মিথ্যা অপবাদে তাঁহার হৃদয় বিষাক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তিনি নির্দ্দোষী, কিন্তু নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ের অপমান মনে হইল, তিনি কেবল ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—"মহিষি, এসব কথা শুনিতে আমার অবসর নাই, আমার কাজ আছে, চলিলাম, আজ রাত্রে হয়ত আসিতে পারিব না।"

রাজা চলিয়া গেলেন—মহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া-গেল। রাণীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহার এই উত্তর—এই ব্যবহার ? একটা সান্তনার কথা কহিয়া একবার আদর করিয়া রাজা যদি কহিতেন সব মিথ্যা—তাহা হইলে কি তাঁহার এই সন্দেহ এই যন্ত্রণা নিমেষে অন্তর্হিত হইত না ? তবে কি সত্য—সবই কি সত্য ? তাঁহার প্রতি আর রাজার ভালবাসা নাই ? সমস্ত হৃদয় প্রাণ যাহার চরণে ঢালিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে কি একটা মম-তার কথাও আর পাইবার আশা নাই ?

রাণী অসহ্য মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া সমস্ত রজনী কাঁদিয়া অতিবাহিত করিলেন, পরদিন তাঁহার সেই গভীর বিষাদে একটি উদাস-ভাবের ছায়া পড়িল। তিনি আর

রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; ভাবিলেন "হউক যাহা হইবে হউক"। মাঝে মাঝে কেবল হরিতাচার্য্যের কথা রাণীর মনে পড়িতে লাগিল—"রাজার অমঙ্গল।" কি অমঙ্গল? ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে এই কি অমঙ্গল? ইহা রাজারও অমঙ্গল নহে রাজ্যেরও অমঙ্গল নহে—একমাত্র তাঁহারই অমঙ্গল, রাজার স্নেহ প্রেম হারাইলে একমাত্র তাঁহারই ক্ষতি, ইহাতে অন্যের কি? তিনি বুঝিলেন হরিতাচার্য্য তাঁহার কষ্ট নিবারণ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে আর কাহারো অমঙ্গল হইতে পারে না।

গভীর ভালবাসার আঘাত পাইলে—মর্ম্ম যন্ত্রণায় আকুল হইলে—যে শূন্যময় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া হৃদয় কোন দিকে আর আলোককণাও দেখিতে পায় না সেই নিরালোক, শূন্য-সমুদ্রে আত্মহারা হইয়া রাণী ভাবিলেন "আমি কে? আমার আবার মঙ্গল অমঙ্গল কি? হউক যাহা হইবার হউক, ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে হউক"।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

রুক্মার কাছে হরিদাচার্য্য সকল কথাই শুনিলেন, রাজার আচরণ, রাণীর মনের কষ্ট, অথচ ইহার প্রতিকারের প্রতি অনাস্থা—সকলি শুনিলেন। হরিদাচার্য্য দেখিলেন ভবিতব্য অক্ষত পদক্ষেপে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে বুঝি আর বাধা দেওয়া যায় না। তিনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কহিলেন—

"মা ইচ্ছা করিয়া কেন এ কষ্টভোগ করিতেছ?"

রাণী বলিলেন—"সাধ করিয়া কে কষ্ট ভোগ করে?"

পুরো। "তবে কেন তুমি ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছ না। তুমি এইরূপ ঔদাস্যভরে থাকিলে যে সব যায়!"

রাণী। "ঔদাস্য ভরে থাকতে পারিলে ত আমারি ভাল। কেন নিষ্কাম হইতে ত আপনারাই উপদেশ দেন?

পুরোহিত। মা, দুঃখ ভোগ করা কি নিষ্কাম হওয়া? দুঃখ দূর করাই নিষ্কাম হইবার উপায়।"

রাণী। "লোকের দুঃখ দূর করা, কিন্তু নিজে ভোগ করা।"

পুরো। "না মঙ্গল নিজের পরের নাই, যাহাতে নিজের

পরের বিশ্বসংসারের মঙ্গল হয়—তাহাই আমাদের করণীয়। নিষ্কাম হইলে পরের মঙ্গলের সহিত নিজের চূড়ান্ত মঙ্গল সাধিত হয়—তাই নিষ্কাম ধর্ম্ম এত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং মঙ্গল অভিপ্রায়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই নিষ্কাম হইবার উপায়, —কর্ম্মে উদাসীনতা জড়তা মাত্র তাহা কর্ম্মহীনতা নহে।”

রাণী। “কিন্তু আমার কি সাধ্য আমি জগতের মঙ্গল করি? কি আমার কর্ত্তব্য আমি কি করিয়া বুঝিব? আমি সমুখে যে গরীবকে দেখিতেছি—তাহাকেই আগে দান করিতে ইচ্ছা হয়; সত্য বটে, সংসারে সেই দানের আরো যোগ্য পাত্র আছে কিন্তু তাই ভাবিয়া সেই দান তুলিয়া রাখাই কি আমার কর্ত্তব্য? আমার নিজের মঙ্গলে আর একজনের অমঙ্গল, রাজার মঙ্গলে রাজ্যের অমঙ্গল, আমি রাজ্যের মঙ্গল করিতে গেলে রাজা কষ্ট পান। আমি স্ত্রী, রাজার কষ্টমোচন করাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।”

পুরোহিত স্তব্ধ হইলেন, কিছু পরে বলিলেন—“মহিষি, স্বামীর মঙ্গল সাধনই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যাহা করিতেছ তাহাতে কি তাঁহার মঙ্গল হইতেছে? তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিনী, তাঁহাকে মোহ হইতে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। মোহই অমঙ্গলের মূল, তুমি তাঁহাকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে?”

মহিষী চুপ করিয়া রহিলেন—খানিক পরে বলিলেন—

"দেব, কি বলিতেছেন বুঝিলাম না? ভালবাসা যদি মোহ হয় আমাকে ভালবাসাও ত মোহ? যতদিন সংসারে থাকিবেন সে মোহ হইতে ত তিনি পার পাইবেন না, তবে কেন আমি তাঁহার পথের কণ্টক হইব? আমি রাণী ছিলাম, আর একজন না হয় আমার স্থানে বসিবে।"

পুরো। "না দেবি, সংসারীব্যক্তির পক্ষে সংসার-ধর্ম্ম মোহ নামের বাচ্য নহে। অধিকারী ভেদে ধর্ম্ম। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ মোহ সুতরাং অধর্ম্ম, কিন্তু সংসারীর পক্ষে বিবাহ মোহ নহে অধর্ম্মও নহে! তুমি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, তোমাকে ভালবাসা তাঁহার মোহ নহে, কেননা তাহা হইতে অন্যায় অমঙ্গল উৎপন্ন হইবে না।"

রাণী। "আর একজনও বিবাহিতা হইবে। রাজা যে এতদিন অন্য বিবাহ করেন নাই ইহাই ত আশ্চর্য্য!

পুরো। "তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু এস্থলে বিবাহ হইবার নহে, রাজা ভীলকন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে পারেন না। রাজা নিজের বিরুদ্ধে নিজে কাজ করিতেছেন তুমি তাঁহাকে উদ্ধার কর। কেবল তাহাই নহে, একজন পবিত্র বালিকা কলঙ্কিত হইতেছে—তুমি তাহাকে রক্ষা কর—সে স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোককে না রাখিলে কে রাখিবে?"

রাণী। "কিন্তু নিজে যদি সে নিজেকে না রাখে ত কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে!"

পুরো। "সে বালিকা, নিজেকে রক্ষা করা তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তুমি চেষ্টা করিলে তাহা পারিবে। রাজার কর্ত্তব্য এখন তোমার পালনীয়।"

মহিষী তাহা বুঝিলেন, কিছু পরে বলিলেন—"করিব—যাহা অদৃষ্টে থাকে করিব—কিন্তু কি করিব ?

পুরো। তাহাকে রাজার দৃষ্টি পথ হইতে দূরে রাখ—আর কিছু করিতে হইবে না।

রাণী বলিলেন—"কিন্তু—সত্য যদি—" বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

পুরোহিত বলিলেন—"না মা আর ইতস্তত করিও না—সময় বহিয়া যাইতেছে।"

পুরোহিত চলিয়া গেলেন, রাণী ভাবিতে লাগিলেন, "এব কি সত্য ? কি করিয়া জানিব এ সমস্ত মিথ্যা নহে ? কি করিয়া জানিব রাজার উপর মিথ্যা সন্দেহ করিতেছি না ?" রাজার নিকট হৃদয় খুলিয়া তাঁহার হৃদয়ের কথা শুনিবার জন্য তিনি আকুল হইলেন—সমস্ত মান অভিমান ভুলিয়া তাঁহাকে আজ সব জিজ্ঞাসা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এরূপ সঙ্কল্প ত প্রতিদিনই করেন—তবে তাহা পারেন কই ?—তাঁহাকে দেখিলে কি যে কষ্টে অভিমানে মুখ বন্ধ হইয়া যায় সে সঙ্কল্প রাখিতে আর কই পারেন! রাণী দেবতার নিকট বল ভিক্ষা করিলেন, আকুল হইয়া কাঁদিয়া মনে মনে কহিলেন "দেব দেব মহা-

দেব, আমার স্বামীর নিকট আমি ঘোর অপরাধী, এ অপ-রাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমায় বল দাও, তিনি স্বামী, তিনি দেবতা, তিনি যাহা করেন তাহা দোষের হইতে পারে না—ভগবান, তাঁহার অপরাধ যেন আমার মনে না আসে, আমাকে বল দাও আমার অপরাধ যেন ভুলিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা পাই।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিকুঞ্জ পথ।

রাজা রাণী দুজনেরি হৃদয়ে অসীম বেদনা, প্রাণে ঘোর-তর অশান্তি। রাজা ভাবেন “আমি সন্দেহের কাজ কিছুই করি নাই—কেন এ সন্দেহ? যাহাকে অসীম ভালবাসি তাহার নিকট হইতে এই প্রতিদান”?

এই চিন্তার মধ্যে এই কষ্টের মধ্যে মাঝে মাঝে সুহা-রের কথা যদি মনে পড়ে, তাহার সেই ফুলের মত সুন্দর মুখখানি যদি মানস নয়নে জাগিয়া উঠে রাজা যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়েন—কি যেন একটা লজ্জার ভাবে কি যেন একটা দোষ করিয়াছেন—এই ভাবে নিজের কাছেই নিজে জড়সড় হইয়া পড়েন।

কিন্তু এ অবস্থায় যেমন হইয়া থাকে,—অধিকক্ষণ মনে সে ভাব স্থায়ী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ ভাবের হাত

হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস জন্মে, যাহাকে দোষ বলিয়া মনে আসিতেছে তাহাকে অদোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার বাসনা প্রবল হয়—সেই বাসনায় অনুযায়ী এমন সকল যুক্তিরাশি আবির্ভূত হইতে থাকে যে তাহার মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার পূর্ব্বের সঙ্কোচ ভাব চাপা পড়িয়া যায়। তখন রাজা ভাবেন "সৌন্দর্য্য দেখিতে কাহার না ভাল লাগে? ফুল দেখিয়া জ্যোৎস্না দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না প্রীতির সঞ্চার হয়—কিন্তু তাহাকে কি প্রণয় বলা যায়? না তাহাতে দোষণীয় ভাব কিছু আছে?"

রাজা বুঝেন না দোষ সৌন্দর্য্যে নহে দোষ মনে—দোষ বাহিরে নহে দোষ ভিতরে। সূর্য্যের আলোক সকল সময়েই বিমল উজ্জল নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু রঙ্গিন কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে তাহা যেমন বিকৃতবর্ণ হইয়া যায়—বিকার যুক্ত হৃদয় দিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধতাও তেমনি মলিন হইয়া পড়ে। রাজা যদি ইহা বুঝিতেন তবে কিরূপ হৃদয় দিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে ভাল বাসিতেছেন তাহাই দেখিতেন, সৌন্দর্য্যকে ভালবাসা দোষের কি না ইহা বিচার করিতেন না; আত্ম পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি আত্মপরীক্ষা করিতে চাহেন না, তিনি যে নির্দ্দোষ এইটুক মাত্র তিনি শুধু বুঝিতে চাহেন।

বুঝিতে চাহিলে কি না বুঝা যায়? বুঝিতে চাহিলে প্রকাণ্ড দোষও এমন লঘুতর ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে—

যে সে দোষের আর দোষত্বই থাকে না—রাজা ত সে হিসাবে যথার্থই নিরপরাধ। তাঁহার দোষ এত সামান্য—যে আত্ম পরীক্ষারূপ অনুবীক্ষণ দিয়া না দেখিলে তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ হইবারই নহে। সুতরাং হঠাৎ কখনো কখনো রাজার হৃদয়ে উক্তরূপ যে মেঘভার জন্মে, বাসনা-প্রসূত যুক্তির বাতাসে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়, তখন তাঁহার হৃদয়ের নির্ম্মলতা তিনি অধিক করিয়া উপভোগ করেন আর রাণীর সন্দেহ শত গুণ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, একটা গর্ব্বিত ক্রোধের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, কখনো কখনো বা ক্রোধের পরি-বর্ত্তে রাণীর প্রতি একটা করুণ মমতার ভাব আসিয়া পড়ে—মনে করেন—"রাণীকে তাঁহার বুঝাইয়া বলা উচিত—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই,—লোকের কথায় কেন তাঁহাকে এরূপ সন্দেহ করিতেছেন।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিয়া যখন রাণীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ নয়নে পড়ে, তাঁহার বিষণ্ণ কাতর ভাবে তিনি যখন তীব্র তিরস্কার শুনিতে পান, তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয় তখন একটি বিষম সঙ্কোচের ভাবে প্রপীড়িত হইয়া উঠে, যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন কিছুই আর বলা হয় না—দুএকটি বাজে কথার পর তাঁহার অনেক কাজের কথা মনে পড়িয়া যায়—তিনি বাহিরে চলিয়া যান। যে অশান্তি লইয়া রাণীর নিকট গিয়াছিলেন—তাহা হইতে অধিকতর অশান্তি লইয়া

তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসেন—জীবনটা সুখ-শান্তিহীন শুধু একটা হাহাকার বলিয়া মনে হয়। এই অশান্তি অন্ধকারের মধ্যে সেই নিস্তব্ধ বাপীতীরের সুন্দর মুখচ্ছবি বড় অধিক করিয়া মনে পড়ে, সেখানকার প্রশান্ততা—সেখানকার সুমধুর নীরবতা অতি গভীর রূপে অনুভব করেন—কিন্তু সেদিকে যাইতে আর তাঁহার সাহস হয় না।

রাজা যখন এইরূপে একটি আদরের কথা না কহিয়া একটা ভালবাসার কথা না কহিয়া চলিয়া যান—রাণীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। রাণী জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া মনে মনে ভাবেন "এ দুঃখে একটা সান্তনা নাই, একটা মমতার কথা পর্য্যন্ত নাই—ওগো সে এত নিষ্ঠুর—এখন এত নিষ্ঠুর? আমার সেই প্রেমময় করুণাময় স্বামী এককোঁটা অশ্রুজল যাহার প্রাণে বিদ্ধ হইত, একটু ম্লান দেখিলে যে সহিতে পারিত না—সে আজ এত নিষ্ঠুর? আমার অসীম দুঃখে অসহ্য যাতনায় আজ সে উদাসিন! সারাদিন কাছে থাকিয়া যাহার তৃপ্তি হইত না—এক মুহূর্ত্ত নয়নের আড়াল করিলে যাহার প্রাণে বিরহ বেদনা বাজিত আজ একবার সে ফিরিয়া চাহে না, এত নিষ্ঠুর সে এত নিষ্ঠুর!

"প্রভু আমার, স্বামি আমার, ও চরণে আমি কি দোষ করিয়াছি—কেন এ অবহেলা? সত্যই কি তবে তোমার

সে ভালবাসা নাই, সত্যই কি তবে তোমার হৃদয় অন্যের জন্য ব্যাকুল? যদি তাহাই হয়—আমার কি সে কথা শুনিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই, আমি কি তোমার বন্ধুত্বেও অধিকারী নহি, সর্ব্বস্বধন, আমি যে তোমার সুখের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহা কি তুমি জান না প্রভু? কিম্বা সব দোষই বুঝি আমার। বুঝি সব মিথ্যা--বুঝি সব মিথ্যা। আমি নিজের মনের গুণে নিজের দোষে নরক অনল ভোগ করিতেছি এবং তাঁহার বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইতেছি।”

রাণী উৎসুক হইয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করেন, আসিলে মনের সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিবেন। কিন্তু রাজাকে দেখিলে তাঁহার আর সে ভাব থাকে না, কি এক মর্ম্মভেদী অভিমানে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, মনের সহস্র আবেগ জমাট বাঁধিয়া আসে—যদিই বা মুখ হইতে কোন কথা বাহির হয় সে অভিমানের কথা। রাজা তাহা সন্দেহ বলিয়া বুঝেন, রাজা যদি এক মুহূর্ত্ত থাকিতেন সে কথার পর আর অর্দ্ধ মুহূর্ত্তও থাকেন না—বাণাহতের মত সরিয়া পড়েন।

এইরূপে দিন যাইতেছে। দিন দিন উভয়েরি যন্ত্রণা বাড়িতেছে, জীবন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে—অথচ কেহ কাহাকেও কিছু খুলিয়া বলেন না—ইচ্ছা করিলেও পারেন না। দৈব যেন অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে পদক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে তফাৎ করিয়া দিতেছে।

যে দিন পুরোহিতের সহিত রাণীর কথা হইল সে দিন রাণী হৃদয়ে বজ্রবল বাঁধিলেন, ভাবিলেন যেমন করিয়াই হউক রাজাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টের বাদ।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া শুনিলেন রাণী বাগানে। একটু আশ্চর্য্য হইলেন। যে দিন হইতে তাঁহাদের মনান্তর হইয়াছে সেই দিন হইতে রাণী আর বাগানে যান নাই।

রাজা উদ্যানে পদার্পণ করিবা মাত্র সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বহুদিনের স্মৃতির মত তাহাতে সহসা তাঁহার হৃদয় রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কত দিন কত দিন পরে এই মধুর জ্যোৎস্নালোকে এই মধুর উপবনে সঙ্গীর্তের সেই মধুর হিল্লোল! সেই গীতধ্বনি শুনিয়া তাঁহার আগেকার কত প্রেমের কাহিনী জীবনের কত সুখের চিত্র মনে জাগিয়া উঠিল, রাজা ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন—গানটি সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল—

কেন সখি আসিতে না চায়?
যদি বা আসে গো হেথা
কেন সখি থাকিতে না চায়?
যাই যাই করি করি
কেন বুকে ছুরি বিঁধে নিঠুর কথায়?
সখি—কেমন করিয়া প্রাণ ধরি
তার যদি এতই অসাধ
থাকিতেই বলি বা কি করি?
সখি—হাসিয়া যাইতে তারে বলি,
মনে মনে যাতনায় জ্বলি,
ভয়মনে—সে যাতনা জানিতে বা পায়,
পাছে আঁখি উথলায়।
সখি—আমার ত দেখিলে তাহায়
শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখ পানে চেয়ে
হৃদি উঠে উথলিয়ে,
শতবার বুক মাঝে
বিদ্যুতের লহরী খেলায়।
সদা ভয়ে ভয়ে সারা
বুঝি পড়িলাম ধরা
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়।

কই সখি—বুঝিতে না পারে
শুধু যাই যাই করে ;
মন মন না বুঝিলে কে বুঝাবে তায়।
সখি বড় ভাল বাসি
সে মুখের হাসি
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়।
তবু—কেন সাধ প্রাণে
দেখি সে নয়ানে
ফু'টছে বিরহ ব্যথা না দেখে আমায়।
এই—ব্যথা টুক তার
প্রাণ যাচে বার বার,
কেন সখি—এ হেঁয়ালি বল কে বুঝায় ?

গান শুনিয়া রাজার প্রাণে একটা অনুতাপ উথলিয়া উঠিল—রাজার হৃদয় একটা কোমল ভাবে আর্দ্র হইতে লাগিল, যেন একটা অজানা দুঃখে তাঁহার নেত্র ছল ছল করিয়া আসিল, রাজা ধীরে ধীরে রাণীর নিকট গমন করিলেন, রাণী তখন প্রস্তর-বেদীতে শুইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। রাণী যখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন সেই আকুল-নয়নের দৃষ্টিতে রাজার হৃদয় কি একটা আকুলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—রাজা ধীরে ধীরে তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। কিন্তু করিলেন কি ? তাহাতে রাণীর হৃদয়ের যত্নরুদ্ধ অশ্রু-

জল সহসা যে অন্তরতল ভেদ করিয়া উঠিল, অনন্ত সুখের আবেগে মগ্ন হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার আর কিছুই বলা হইল না। খানিক পরে রাজা বলিলেন "সেমন্তী"?

সেমন্তী কেবল অশ্রু পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। রাজা তাঁহার অলক গুচ্ছগুলি আগেকার সময়ের ন্যায় হাতে করিয়া গুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—

"সেমন্তী আমি কি দোষ করিয়াছি"?

কাঁদিয়া সেমন্তীর হৃদয় ভার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল, রাজার আদরে বহু দিনের পর তাহার হৃদয় প্রশস্ত সুখে পূর্ণ হইয়াছিল—সেমন্তী উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"নাথ তুমি কি দোষ করিবে? আমিই দোষী, আমাকে ক্ষমা কর।"

রাজা একটু হাসিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা সে কথা থাক, দোষ যাহারই হউক, তোমার আর ত সে ভাব ফিরিবে আসিবে না, সেইটে বল দেখি?

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—

'তোমার এ রকম মুখ দেখিলে আমার কি কিছু মনে হয়? তুমি কেন আগেকার মত আদর করনা'?

রাজা বলিলেন "তুমি কেন কথা কহ না?"

রাণী না কথা কহিলে তবে রাজার এখনো কষ্ট হয়! রাণীর মনে বড় আহ্লাদ হইল, তাঁহার ঐ কথা আবার

কই সখি—বুঝিতে না পারে
শুধু যাই যাই করে ;
মন মন না বুঝিলে কে বুঝাবে তায়।
সখি বড় ভাল বাসি
সে মুখের হাসি
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়।
তবু—কেন সাধ প্রাণে
দেখি সে নয়ানে
ফু'টছে বিরহ ব্যথা না দেখে আমায়।
এই—ব্যথা টুক তার
প্রাণ যাচে বার বার,
কেন সখি—এ হেঁয়ালি বল কে বুঝায় ?

গান শুনিয়া রাজার প্রাণে একটা অনুতাপ উথলিয়া উঠিল—রাজার হৃদয় একটা কোমল ভাবে আর্দ্র হইতে লাগিল, যেন একটা অজানা দুঃখে তাঁহার নেত্র ছল ছল করিয়া আসিল, রাজা ধীরে ধীরে রাণীর নিকট গমন করিলেন, রাণী তখন প্রস্তর-বেদীতে শুইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। রাণী যখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন সেই আকুল-নয়নের দৃষ্টিতে রাজার হৃদয় কি একটা আকুলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—রাজা ধীরে ধীরে তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। কিন্তু করিলেন কি ? তাহাতে রাণীর হৃদয়ের যত্নরুদ্ধ অশ্রু-

জল সহসা যে অন্তরতল ভেদ করিয়া উঠিল, অনন্ত সুখের আবেগে মগ্ন হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার আর কিছুই বলা হইল না। খানিক পরে রাজা বলিলেন "সেমন্তী" ?

সেমন্তী কেবল অশ্রু পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। রাজা তাঁহার অলক গুচ্ছগুলি আগেকার সময়ের ন্যায় হাতে করিয়া গুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—

"সেমন্তী আমি কি দোষ করিয়াছি" ?

কাঁদিয়া সেমন্তীর হৃদয় ভার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল, রাজার আদরে বহু দিনের পর তাহার হৃদয় প্রশস্ত সুখে পূর্ণ হইয়াছিল—সেমন্তী উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"নাথ তুমি কি দোষ করিবে ? আমিই দোষী, আমাকে ক্ষমা কর।"

রাজা একটু হাসিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা সে কথা থাক, দোষ যাহারই হউক, তোমার আর ত সে ভাব ফিরিয়া আসিবে না, সেইটে বল দেখি ?

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন—

'তোমার এ রকম মুখ দেখিলে আমার কি কিছু মনে হয় ? তুমি কেন আগেকার মত আদর করনা' ?

রাজা বলিলেন "তুমি কেন কথা কহ না ?"

রাণী না কথা কহিলে তবে রাজার এখনো কষ্ট হয়! রাণীর মনে বড় আহ্লাদ হইল, তাঁহার ঐ কথা আবার

শুনিতে ইচ্ছা হইল, তিনি অভিমানের ভাবে ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

"নাথ আমার কথা কি তোমার আর ভাল লাগে" ?

এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল এই কথায় হঠাৎ রাজার ভাবান্তর হইল—কথাটা রাজার ভাল লাগিল না—রাজা ইহা অবিশ্বাস বলিয়া বুঝিলেন।

কিন্তু রাণী বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস হইতে একথা বলেন নাই, তিনি বুঝিয়াছেন রাজা তাঁহাকে ভালবাসেন। কিন্তু রাজার মুখ হইতে বার বার তিনি সেই কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে চান, তাঁহার প্রেমাদরে সমস্তক্ষণ লীন হইয়া থাকিতে চান। সেই বাসনা হইতেই তাঁহার উক্ত অভিমানের কথা। কিন্তু সংসারে কেহ কাহারো মন বুঝে না। রাণীর সেই অভিমান রাজা অবিশ্বাসের অভিমান বলিয়া বুঝিলেন। রাজা দেখিলেন আবার সেই সন্দেহ! তাঁহার মন একটা নিরাশার ভাবে পূরিয়া গেল। মনে হইল রাণীর ঐ বদ্ধমূল অবিশ্বাস ভাঙ্গান তাঁহার সাধ্য নহে। বলিলেন "মহিষি, যদি তাহাই তোমার মনে হয় ত আমার বলিবার কিছুই নাই"।

রাজার কঠোর উত্তরে রাণীর মর্ম্মবিদ্ধ করিল—রাণী বলিলেন "মহারাজ সত্য সত্যই কি বলিবার কিছুই নাই"।

রাজা বলিলেন 'না'।

বহুদিন পরে দুজনে যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন, বহু

দিন পরে দুজনের হৃদয়ের মেঘ যদি বা অপসারিত হইয়া-ছিল—আবার সহসা তাহা গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল, আবার তাহা বজ্র-কম্পনে আলোড়িত হইয়া উঠিল। রাজা যখন কিছু পরে উঠিয়া গেলেন রাণীর সহসা চমক ভাঙ্গিল। করিলেন কি? সমস্ত সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলেন! রাজাকে কিছুই বলিলেন না—বলিবার অবসর দিলেন না! কেবল তীব্র কথার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে তাড়াইলেন! রাণীর মনে হইল তাঁহারই সমস্ত দোষ। তীব্র অনুতাপের দংশনে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নের শতধারা শুকাইয়া গেল। অভিমানের কষ্ট, রাজার অনাদর ভুলিয়া গেলেন। একটিবার রাজার সহিত দেখা করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য ছটফট করিতে লাগি-লেন—কিন্তু কি করিয়া এখন আবার তাঁহাকে ডাকেন, ডাকিলেও কি তাঁহার এ দোষ ক্ষমা করিয়া রাজা এখনি আর আসিবেন? তাহাতেও ভরসা নাই, তিনি উঠিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিঃসন্দেহ।

রাণী খবর নিয়া শুনিলেন রাজা বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তাঁহাব প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রাণী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না, কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দ্বাব দেশে

আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজা একাকী গিয়াছেন কি না, কোনদিকে গিয়াছেন—ইত্যাদি।

প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"হ্যাঁ একাকীই গিয়াছেন—আর ঐ তরুপথের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়াছি। বোধ হয় বেশী দূরে যান নাই, তরুকুঞ্জে বেড়াইতে গিয়া থাকিবেন"।

বলিয়া প্রহরী পথ দেখাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া রুক্মার সহিত সেই দিকে গমন করিলেন। প্রহরী যে ইহাতে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হইল তাহাও নহে। এমন ত প্রায়ই হইয়া থাকে রাজা রাণী উভয়ে রাত্রে ভ্রমণে বাহির হন সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যান না। আর রাজা নিকটে বেড়াইতেছেন শুনিলে তাঁহাকে বিস্মিত করার অভিপ্রায়ে রাণী কখনো কখনো একাকীও তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকেন—আজ ত সঙ্গে তবু রুক্মা আছে। আসল কথা রাজপুরীর চারিপাশের ভ্রমণস্থান এত নিরাপদ যে রাত্রি বলিয়া ভ্রমণে কাহারো ভয় হয় না।

রাণী খানিকদূর গিয়া যখন তরুপথের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন যেন অস্পষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। এই সময় অন্য পথ দিয়া একজন কাঠুরিয়া ভীল এই তরুপথে আসিয়া পড়িয়া সহসা উর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, "সুহার এখনো হেথায়।"

বলিয়া তরুকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। সে নাম রুক্মাও শুনিল—রাণীও শুনিলেন—সেমন্তীর হৃৎপিণ্ডে দারুণ বেগে শোণিত রাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল—তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, রুক্মা কাতরকণ্ঠে বলিল, "আর কেন চল ফিরিয়া যাই"—

রাণী কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু না ফিরিয়া অগ্রসর হইলেন, নিজের মৃত্যু নিজে উপভোগ করিতে অগ্রসর হইলেন। উপভোগ? হ্যাঁ উপভোগ বই কি। কষ্টও কি উপভোগ্য নহে? বিশেষ ভালবাসার কষ্ট! এ কষ্ট কেহ পাইতে চাহে না সত্য—কিন্তু পাইলে কেহ ফেলিতেও চাহে না, জানি না এ কষ্টের কি এত মোহ!

রাণী চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায় যাইতেছেন কি করিতেছেন—জ্ঞানহীন হইয়া চলিতে লাগিলেন। সহসা গীতধ্বনি থামিয়া গেল—রুক্মা তাঁহার হাত ধরিয়া একটা গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর? তাহার পর কম্পমান-দেহ অবসন্ন-মহিষী সেই বৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলনে বিরহ।

যে দিন হইতে সেই নিকুঞ্জ মধ্যে জলাশয় তীরে বালিকা নয়নে নয়নে রাজাকে দেখিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার বিকশিত ভাব একটি ম্লানময় গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এলো মেলো হাসি গল্প আর তাহার ভাল লাগে না, কথায় কথায় কেমন দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে, তাহার শুষ্ক মুখ, নীরব ভাব দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে ত অমনি সুহার চটিয়া উঠে। সুবিধা পাইলেই সে লোকের দৃষ্টি এড়াইতে চায়। প্রতিদিন বিকালে নিয়মিত সেই জলাশয়তীরে বেড়াইতে আসে। কিন্তু আগে এইখানে আসিয়া যেমন তৃপ্তি লাভ করিত, এখন আর তেমন তৃপ্তি লাভ করে না। একটা অতৃপ্তি, অভাবের মধ্যে সে চারিদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহে! বাতাসের শব্দেও যেন চমকিয়া উঠে? কেন তাহার এ অতৃপ্তি? কিসের এ অভাব! আগে রাজাকে দূর হইতে দেখিলেই সে সন্তুষ্ট হইত, এখন তবে কি সুহার রাজাকে নয়নে নয়নে দেখিবার প্রত্যাশা করে? সেই জন্যই কি তাহার এ অতৃপ্তি?

কেন অতৃপ্তি বালিকা তাহা বুঝে না—তাহার কেবল সেই দৃষ্টি মনে পড়ে,—সেই মোহময় মধুময় দৃষ্টি, সমস্ত

জগতের লুকায়িত সৌন্দর্য্য যে দৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেই দৃষ্টি ভাবিতে ভাবিতে তাহার মরিতে ইচ্ছা করে,—কিন্তু আর একবার সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিবার জন্য সে ব্যস্ত কি না তাহা সে জানে না,—সে প্রত্যাশা তাহার পক্ষে বড় অধিক প্রত্যাশা। প্রতিদিন সে যখন জলাশয় তীরে আসে, তাহার বড় ভয় হয় পাছে মহারাজকে দেখিয়া ফেলে! যখনি তাহার মনে হয়—"যদি মহারাজ আসেন?" অমনি সভয়ে সঙ্কোচে যেন মরিয়া যায়। অথচ যখন আসিয়া দেখে—তিনি নাই—হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে নিশ্বাস উথলিয়া উঠে, নিজের নিশ্বাসে নিজেই চমকিয়া উঠে, নিভৃত বনপ্রদেশ পর্য্যন্ত যেন চমকিয়া উঠে। বালিকা তখন আস্তে আস্তে জলাশয় তীরে আসিয়া বসে, জলে নয়ন ভাসিতে থাকে। কেন ভাসে—সে তাহা জানে না, রাজাকে দেখিবার জন্য যে সে আকুল সে তাহা জানে না। রাজাকে দেখিবার আশা যে তাহার দুরাশা! সে আশা মনে আনিতেও তাহার সাহস নাই! তাহার জীবনের সম্মুখে যে অনন্তকাল পড়িয়া আছে ইহার এক একটি ক্ষুদ্র প্রতিদিন এইরূপ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার কাটিবে—ইহাই সে জানে, তাহার এই দগ্ধ হৃদয় প্রতিদিন এইরূপে তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইবে, ইহাই মাত্র সে জানে। ইহা ছাড়া আর কিছু তাহার মনে আসে না। কেমন করিয়া আসিবে!

ধূমকেতু আকাশের দেবতা, মর্ত্ত্যের তরুলতার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের জীবন পথে উদিত হইয়া শুষ্ক করিয়া দিয়া যায়, শূন্যময় দগ্ধজীবন লইয়া তরুলতা অনন্ত কাল ধরিয়া এখানে পড়িয়া থাকে। যে চলিয়া যায়—সে একবার ফিরিয়া চাহে কি? ক্ষুদ্র হৃদয়দিগকে কিরূপ আকুল করিয়া দিয়া গেল একবার ভাবে কি? সে আকাশের দেবতা আকাশে বিচরণ করে—তাহার দৃষ্টিতে মর্ত্ত্যের কোন প্রাণ দগ্ধ হইয়া গেল কি না তাহা সে ভাবে না! তরুলতা শুষ্ক হৃদয় লইয়া মাটিতে মিশাইতে মিশাইতে কাঁদিয়া মরে।

বালিকা আজ জলাশয় তীরে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল। তাহার সেই আকুল দৃষ্টি হইতে, মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতে একটা করুণ কাতর ভাব উত্থিত হইয়া চাঁদের প্রাণ যেন সিক্ত করিতেছিল।

রাজা এতদিন পরে আজ আবার সেই নিকুঞ্জ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—বালিকার নিকট দাঁড়াইয়া সেই জ্যোৎস্নাচুম্বিত অনুপম মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গীত-সুধা পান করিতেছিলেন। ঘুমন্ত জ্যোৎস্নালোকে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের প্রেমময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আজ বিরাজিত। এক মধুর শান্তিতে এক অপরিমিত সুখানন্দে তাঁহার চারিদিক ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি অতীত বিস্মৃত হইয়াছেন, ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়াছেন, বর্ত্তমানের সেই

মুহূর্ত্ত ছাড়া আর সকলি বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজা যে কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপে বালিকার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন—তাহা বালিকা জানে না, বালিকা খানিক পরে গান বন্ধ করিয়া যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল—তখন সহসা তাহার রাজার দিকে দৃষ্টি পড়িল, বালিকা চমকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ-যন্ত্রের সবল স্পর্শে যেন সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল, বালিকা লতিকার ন্যায় কাঁপিয়া জলমধ্যে পড়িয়া গেল। রাজাও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, দেখিতে না দেখিতে তাহাকে কোলে লইয়া তীরদেশে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন।

বালিকার শরীর কাঁপিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে,—বালিকা অবনত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে ধীরে ধীরে চাহিল, উভয়ে মুগ্ধের ন্যায় উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। বিমল জ্যোৎস্না, বিমল পুষ্পগন্ধময় নিকুঞ্জ, উভয়ের আর্দ্র মুখে মিলনের আনন্দ ভাব, নয়নে বিরহের অশ্রুজল, দুজনের প্রাণের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, দুজনের নিশ্বাস দুজনের মুখে আসিয়া লাগিল—এই সময় একজন ডাকিল—“সুহার”।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্যা।

ক্ষেতিয়া দূর হইতেই সুহার বলিয়া ডাকিয়াছিল। তাহার ডাকে সুহারের চমক ভাঙ্গিল, রাজা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে আস্তে আস্তে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেতিয়া যখন জলাশয় তীরে আসিয়া পোঁছিল, তখন তাঁহারা তত কাছাকাছি নাই, কিন্তু ক্ষেতিয়া তাহাতেই চমকিয়া উঠিল, এই নির্জ্জন নিকুঞ্জে রাত্রিকালে সুহার একাকী রাজার সহিত? সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে তাহার কাঁপিয়া উঠিল, এই সময় যদি তাহার হাতে বাণ থাকিত ত সে রাজার প্রতি অসঙ্কোচে নিক্ষেপ করিতে পারিত। কিন্তু এখন অন্য উপায় অভাবে তাহার সমস্ত ক্রোধ রাশি মাত্র তীব্র প্রাণভেদী কটাক্ষে রাজার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সুহারকে রোষ গর্জ্জিত স্বরে বলিল—"সুহার, চলিয়া আয়"। ক্ষেতিয়ার সেই ব্যবহারে সুহারেরও রাগ হইল, কিন্তু যে অপরাধী তাহাকে পথের লোকের অপমানও সহ্য করিতে হয়, মনের ভাব মনে চাপিয়া লইয়া বালিকা নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। একবার ফিরিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। পথের মধ্যে দুইজনে কোন কথাই কহিল না—দুই জনেই আপনাপন মনের ভাব বহন করিয়া নীরবে চলিতেছিল। সুহারকে ভালবাসিয়া রাজা যে

তাহাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাইতেছেন ক্ষেতিয়া ইহাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এ ভালবাসা তাঁহার ভালবাসা নহে, সুহারের প্রতি অপমান, সুহারের পিতার প্রতি অপমান, তাহার সমস্ত স্বজাতির প্রতি অপমান! হায়! এ অপমান তাহার নীরবে সহ্য করিতে হইল! রাগে কষ্টে অপমানে সে জ্বলিয়া যাইতেছিল; এই নূতন কষ্টের মধ্যে সুহার তাহাকে ভাল-বাসে না এ কষ্ট আর ক্ষেতিয়ার মনে ছিল না; ক্ষেতিয়া হৃদয়ে সমুদ্রের আলোড়ন ধরিয়া নীরবে চলিতেছিল। আর সুহার? ক্ষেতিয়ার প্রতি তাহার যে রাগ হইয়াছিল, দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কেবল রাজার সেই মধুর মূর্ত্তি, সেই মধুর দৃষ্টি, সেই মধুর নিশ্বাসের মধুর স্পর্শ মনে জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, ক্ষেতিয়া যে তাহার সঙ্গে আছে বালিকা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, আপনার চিন্তার মধ্যে আপনি এতখানি সে অভিভূত। কুটীরের দ্বারদেশে পৌছিয়া যেন সুহারের হুঁস হইল ক্ষেতিয়া তাহার সঙ্গে। দ্বারদেশে পৌছিয়া ক্ষেতিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, সুহারও দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ধীরে ধীরে চাহিল। এ দৃষ্টি ক্রোধের দৃষ্টি নহে, একটি কোমল প্রশান্ত অনুনয়ের ভাব এই দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। বালিকা কি যেন তাহাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল। বালিকা যখন চলিয়া গেল তখন সহসা যেন ক্ষেতিয়ার প্রাণের রুদ্ধ আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, ক্ষেতিয়ার ভীমবল দেহ সামান্য লতার ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল. ক্ষেতিয়া নিকটের বৃক্ষশাখা ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহার তলে বসিল। তখনো রাত অধিক হয় নাই, উত্তরের সপ্তর্ষিমণ্ডল তখনো ধ্রুবতারার মস্তক অতিক্রম করে নাই, চন্দ্রমা তখনো ক্ষেতিয়ার মাথার উপরে, তারকারাজ মৃগব্যাধ অদ্ভুতাকৃতি মৃগমণ্ডলির পশ্চাৎ হইতে তখনো তাহার চোখের উপর দক্ষিণে জ্বল জ্বল করিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষেতিয়া ভাবিতেছিল—"ইহার উপায় কি? রাজার হাত হইতে বালিকাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কি করিয়া সুহারকে সাবধান করা যায়? কি করিয়া রাজার উপর হইতে তাহার মন ফিরান যায়? হ্যাঁ মন ফিরান যায়? মন ফিরিলে সে আর রাজার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, নহিলে অন্য উপায় নাই—নহিলে সে বুঝিবে না। রাজা তাহাকে যে অপমান করিতেছেন—সে তাহা বুঝিবে না, সেই অপমানই বালিকা ভালবাসা বলিয়া বুঝিবে,—নির্ব্বোধ বালিকা সে তাহা ভালবাসা বলিয়া বুঝিতেছে।" ক্ষেতিয়া আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ভাবিল—"না সে কিছুতেই বুঝিবে না, সে সাবধান হইবে না, আমি তাহাকে ঢের বলিয়াছি, ঢের

বুঝাইয়াছি—সে বোঝে না—বুঝিবে না, আমি বলিব—জঙ্গুকে বলিব, নহিলে উপায় নাই, অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, কিন্তু আর না, আমি বলিব, জুমিয়াকে বলিব, প্রতিশোধই ইহার একমাত্র উপায়, প্রতিশোধ—রাজার প্রতি প্রতিশোধ, অন্য উপায় নাই!"

বালিকার সেই কোমল দৃষ্টি সহসা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সেই অনুনয়ের দৃষ্টি, সেই আকুল প্রার্থনার দৃষ্টি সে চোখের সমুখে দেখিতে লাগিল, সে বুঝিল বালিকা তাহাকে কি কথা বলিতে গিয়াছিল—কি ভিক্ষা তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্ষেত্রিয়া কাতর হইয়া পড়িল—মনে মনে বলিল, "না বলিব না, সুহার, একথা আমি জঙ্গুকে বলিব না, জুমিয়াকে বলিব না, বলিলে তোমাকে তাহারা লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিবে, তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে, আমি তাহাদের কাহাকেও একথা বলিব না, আমি কেবল তোমার মন ফিরাইব, তাহার উপর হইতে মন ফিরাইব, তাহাকে দেখিলে তুমি ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার অপমান তখন আমার মত এমনি করিয়া তুমি বুঝিবে"—

ক্ষেত্রিয়া তখনি সেই গণৎকারের নিকট গমন করিল। গণক তখন বিছানায় আরাম করিতেছিলেন, বহু কষ্টে সে তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিল—তুলিয়া সমস্ত কথা বলিল। গণক বলিলেন—"আমি তোমাকে যাহা করিতে

বলিয়াছিলাম—সব কর নাই, সেই জন্যই এই সব ঘটিতেছে।”

ক্ষেতিয়া বলিল “সব করিনু মুইডা, একডা বাকী শুধু। রাজাডা যে ফুল দিউছিল সেডা ফেলুতে নারিনু শুধু।”

গণক। যদি তাহা না ফেলিতে পারত কোনই ফল হইবে না, আমার কাছে আসা বৃথা”—

ক্ষেতিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—“কি করি ফেলুব? সুহার যে সেডা কুথায় রাখছে খুঁজি কিছুতেই মিলুল না, বলি দে মুইরে কুথায় আছে?”

গণক গণিয়া বলিলেন—“কোন গুপ্ত স্থানে, তাহার নিজের কোন কৌটাদির মধ্যে, বিশেষ করিয়া না খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।”

ক্ষেতিয়া হতাশ হইয়া বলিল, “যদি খুঁজি না মিলে কি করিবু?”

গণক। “তাহা হইলে জঙ্গুকে সব খুলিয়া বলিতে হইবে?”

ক্ষেতিয়া। “ক্ষ্যামা কর মুইরে, সেডা নারিব, সেডা করুলে সুহার;—মুইডা শুধু ওষুধ চাই।”

গণৎকার রাগিয়া গেলেন—বলিলেন “ওষুধ চাই? নির্ব্বোধ, হতভাগা, ওষুধ! জঙ্গুকে বলাই ওষুধ। জঙ্গুকে বলিলেই সব ঠিক হইবে। সুহারের মন বদলিয়া যাইবে। ওষুধ দরকার হয় তাহার পর দিব।” ক্ষেতিয়া আর

কথা কহিতে সাহস করিল না। মহা সমস্যায় পড়িয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিফল-চুরী।

রাজা জল হইতে যে কমল তুলিয়া সুহারকে দিয়াছিলেন—বালিকা যে তাহা ফেলিয়া দেয় নাই তাহা ক্ষেতিয়া জানিত। ক্ষেতিয়ার কাছ হইতে সে কথা জানিয়া লইয়াই গণক সে ফুল ক্ষেতিয়াকে ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। গণৎকারের বিশ্বাস—সেই ফুলই রাজার ভালবাসা তাহার মনে বদ্ধমূল রাখিতেছে। সেই ফুল প্রথমে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া পরে রাজার সহিত তাহার দেখাশুনা বন্ধ করিলে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া যাইবে। আশ্চর্য্য গণনা শক্তি বটে। তবে আজকালের লোকেরা বিনা গণনাতেও এরূপ অনুমান করিতে পারেন।

বালিকার নিকট সত্যই সে ফুলটি অমূল্য রত্ন। প্রাণের মত করিয়া সে ঐ ফুলটিকে একটি কৌটাতে পূরিয়া কুটীরের বাহির দিকের একটি দেয়ালের একটি গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল, প্রতিদিন লুকাইয়া সেখান হইতে ফুলটিকে বাহির করিয়া সে দেখিত আবার লুকা-

ইয়া তুলিয়া রাখিত। সেই শুষ্ক মলিন ফুলটিতে সে রাজার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত, দেখিতে দেখিতে সেই ফুলটি হইতে দেবাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়া যেন তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করিত। গণৎকারের কথায় ক্ষেতিয়া সেই ফুলটির সন্ধানে ব্যগ্র হইল।

কয়দিন হইতে সে সর্ব্বদাই জুমিয়ার কুটীরে যাইতেছে, সুহারের সঙ্গে দেখাও হইতেছে—কিন্তু দুজনের আর কথাবার্ত্তা হয় না, সুহার ক্ষেতিয়াকে দেখিলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কোন কাজের ছুতা করিয়া এদিকে ওদিকে সরিয়া যায়, ক্ষেতিয়ার অবসন্ন প্রাণ তাহাতে আরো অবসন্ন হইয়া পড়ে, কথা কহিবার আর সামর্থ্য থাকে না। তবে একটা সুলক্ষণ এই, কয়দিন হইতে সুহার আর জলাশয় তীরে যায় না। সেখানে যাইতে আর তাহার পা সরে না। ক্ষেতিয়া প্রায় সারাদিনই তাহাদের কুটীরে থাকে, কয়দিন হইতে সে আর কাঠ ভাঙ্গিতেও বড় যায় না, তাহাকে এড়াইয়া কি করিয়া বালিকা সেদিকে যাইবে? তাহা হইলে সেও সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইবে। সেদিনকার রাতের কথা সে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত বলে নাই বটে কিন্তু আর একদিন যদি সুহারকে সেই দিকে যাইতে দেখে ত সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না—সুহার তাহা মনে মনে বুঝিয়াছে। ইহার উপর আবার স্বাভাবিক সঙ্কোচ—রাজা যদি আবার তাহাকে সেখানে দেখেন

ত কি মনে করিবেন? ভাবিবেন বুঝি তাঁহাকেই দেখিতে আসিয়াছে। ছিঃ তাহা মনে করিলে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে, তাহা হইতে বরঞ্চ আজীবন সে আর তাঁহাকে দেখিবে না!

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর সে দিকে যায় না, যাইবার ইচ্ছায় বুক যেন ফাটিয়া উঠিতে থাকে, তবু সে সেদিকে যায় না, কোন মতে আপনাকে চাপিয়া রাখে। যখন মনে হয় সে আর আপনাকে সামলাইতে বুঝি পারে না তখনি তাড়াতাড়ি সেই ফুলটিকে বাহির করিয়া দেখে। এইরূপে ফুল দেখাটা তাহার বড় বাড়িয়া পড়িতেছে, সময় অসময় নাই সে বাগানের দিকে যায়, যাইয়া যখন তখন লুকাইয়া সেই দেয়াল হইতে কৌটাটি বাহির করে, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আবার ভয়ে ভয়ে তখনি রাখিয়া দেয়। এত সাবধান হইয়া সে এ কাজ করে, তবু তাহার মনে হয় ফুল দেখিবার সময় তাহার যত দূর সাবধান হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততদূর সাবধান হইতে পারে নাই। এমন কি, একদিন সন্ধ্যাকালে ফুলের কৌটাটি রাখিয়া যখন সে ঘরে যাইতেছিল সে দেখিল ক্ষেত্রিয়া বাগান দিয়া আসিতেছে—ছি এমনি সে অসাবধান! সেই রাত্রে সুহার ভয়ে ভয়ে আর একবার দেয়ালের নিকট আসিয়া দেখিল—কৌটা আছে কি না? কিন্তু যখন দেখিল কৌটাও আছে ফুলও আছে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া

ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইহার দুইদিন পরে কৌটাটি খুলিয়া সত্যই আর ফুল দেখিতে পাইল না। সে যেন বজ্রাহত হইল। এ কয়দিন সে ক্ষেতিয়ার সঙ্গে একটিও কথা কহে নাই—কিন্তু আজ ক্ষেতিয়া আসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার ফুল লইয়াছ?" গণংকার যদিও ক্ষেতিয়াকে বলিয়াছিলেন—তুমি ফুল লইয়াছ তাহা সুহারকে জানাইও না। কিন্তু মিথ্যা কওয়া ক্ষেতিয়ার অভ্যাস নাই—সে নিরুত্তর হইয়া রহিল। বালিকা আগেই সন্দেহ করিয়াছিল সেই লইয়াছে—এখন তাহার আর সন্দেহ রহিল না—বুঝিল ঈর্ষা পরবশ হইয়া সে তাহা চুরী করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় রাখিয়াছিস?"

ক্ষেতিয়া অপরাধীর মত বলিল—"ফেলিয়া দিয়াছি!"

বালিকার আর রাগের সীমা রহিল না। ক্ষেতিয়াকে সুহার না ভাল বাসুক তাহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিত, তাহার কষ্টে সে দুঃখিত হইত, কিন্তু আজ তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় সমস্ত হৃদয় তাহার জ্বালা করিয়া উঠিল—সে বলিল—"ক্ষেতিয়া তুই আর এখানে আসিসনে, আমি তোর মুখ দেখিতে পারিনে।"

বালিকার আর তখন ইহাও মনে আসিল না—ক্ষেতিয়াকে রাগাইলে সে বিপদে পড়িতে পারে—সে রাতের কথা ক্ষেতিয়া তাহার বাবাকে বলিয়া দিতে পারে। ঐ কথা বলিয়া বালিকা চলিয়া গেল, কষ্টে ক্ষেতিয়ার হৃদয়

ফাটিয়া উঠিতে লাগিল। তবু সে অপেক্ষা করিয়া রহিল, গণক বলিয়াছেন ফুল ফেলিয়া দিলে সুফল হইবে। কিন্তু দিন যাইতে লাগিল—সুহারের ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখিল না। তাহাকে দেখিলেই সুহারের সেই মধুর সুন্দর মুখ ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠে, তাহাকে সর্পের মত ভাবিয়া সুহার তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া যায়। আরও কিছুদিন চলিয়া গেল, ক্ষেতিয়া আর পারিল না; আবার গণৎকারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। গণৎ-কার সব শুনিয়া আবার রাগ করিলেন, বলিলেন—"সমস্তই তোর দোষ। আমি বলিয়াছিলাম জঙ্গুকে গিয়া বল, সব চুকিয়া যাইবে, তা হইল না! ভোগ্ এখন নিজের বুদ্ধির ফল ভোগ!"

ক্ষেতিয়া বলিল—"তুইডা ত আগে ফুলডা ফেলুতে বলুলি—

গণক। চুপকর। "তোর মত নির্ব্বোধের সহিত কথা কহা বৃথা।"

ক্ষেতিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"একডা মস্ত ভেড়া রাখুছি।

গণৎকার বলিল—"শোন তবে! আর বিলম্ব না করিয়া জঙ্গুকে সব কথা খুলিয়া বল। আর আমার নাম করিয়া বল রাজার সহিত মেয়ের যেন আর দেখা না হয়।"

ক্ষেতিয়া কাতরভাবে বলিল—তুইরে তুইডা ভেড়া দিবু, কিন্তু জঙ্গুরে—

গণৎকার। হাঁ জঙ্গুকে আমার নাম করিয়া বল রাজার সহিত মেয়ের যেন আর দেখা না হয়।

ক্ষেতিয়া আঁ্যা আঁ করিয়া যাহা বলিল—তাহার মর্ম্ম এই, "রাজার সহিত সুহারের আর দেখা হয় না—সুহার দেখা করিতে যায় না। তবে জঙ্গুকে ওকথা কেন বলা।"

গণৎকার বলিলেন—"সুহারের সহিত আর রাজার দেখা হয় না?—তবে কেন বলিলি ফুল ফেলার ফল হয় নাই! কাল তিনটি ভেড়া আনিবি—বুঝিলি?"

ক্ষেতিয়া বলিল—"আন্নুব, কিন্তু সুহার যে মুইডার মুখ দেখ্‌তে চাহে না।"

গণৎকার। সে ক্রমে হইবে। দিনকতক রাজাকে আগে ভুলুক। তবে আবার যদি রাজার সঙ্গে দেখা করে তখন জঙ্গুকে বলিবি বুঝিলি?"

ক্ষেতিয়া। কিন্তু বল্‌লে ত ডর নাই! সুহারের ত—

"গণৎকার অধীর হইয়া বলিলেন "না না তাহাতে কোন ভয় নাই, যাহা বলিতেছি তাহাতে সব ভাল হইবে। আর কথা কহিস না।"

ক্ষেতিয়া আর কথা না কহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

গণৎকার উচ্চৈঃস্বরে আবার কহিলেন—"কাল তিনটি ভেড়া আনিতে ভুলিসনে।"

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সঙ্কল্প।

যাঁহারা বলেন—"কামিনী কোমল প্রাণে সহেনা যাতনা" তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ঠিক বিপরীত। যে যত কোমল তাহার সহিবার শক্তি তত অধিক। অল্প আঘাতে যে নুইয়া পড়ে, বেশী আঘাতে সে অটুট থাকে। ঝড়ে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ছোট ছোট নরম গাছগুলির কিছুই হয় না। তাহারা মৃদুস্পর্শে প্রাণে ব্যথা পায়, বসন্তহিল্লোলে নুইয়া পড়ে তাই তাহাদের এমন কঠিন প্রাণ।

রাণী দেখিলেন, সত্যই রাজা তাঁহাকে ভাল বাসেন না, কেবল তাহাই নহে, রাজা—তাঁহার দেবতা—বিশ্বাস ঘাতক প্রতারক, এতদিন তাঁহাকে ছলনা করিয়া আসিয়াছেন, অসহ্য যন্ত্রণায় রাণী আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই অসহ্য যন্ত্রণাও তাঁহার প্রাণে সহিল, বুঝি স্ত্রীলোক বলিয়াই সহিল। যে ঘটনার শতাংশের একাংশ কল্পনা করিতেও আগে রাণীর বুক ফাটিয়া যাইত, তিনি আপনার মৃত্যু আপনি চক্ষের উপর দেখিতেন, সেই কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত ঘটনাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, দেখিলেন, বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী আর তাঁহার নহেন, আর এক জনের, কিন্তু মরিলেন কই? যাহার প্রাণে একটু অনাদর সহিত

না, তাহার প্রাণে এতখানিও সহিল, যে প্রাণে কাঁটা সহিত না, সে প্রাণে বজ্রাঘাতও সহিল!

এমনি হইয়া থাকে, ইহা নূতন কথা নহে। যখন সহিবার কিছু না থাকে, তখন ফুলের আঘাতও প্রাণে সয় না, কিন্তু সহিবার সময় হইলে সেই প্রাণেই আবার সব সয়। তবে রাণী ইহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার প্রাণ বলিয়াই এতদূর সহিল, তাঁহারই লোহার প্রাণ; বজ্র পীড়নেও তাহা ভাঙ্গে না, বিধাতা তাঁহাকে অমর করিয়া জন্ম দিয়াছেন।

যে রাত্রে রাণী সুহারকে রাজার ক্রোড়ে দর্শন করিলেন, সেই রাত্রি হইতে রাজা রাণীর কথাবার্ত্তা এক রকম বন্ধ হইয়াছে। দিনের বেলা ত রাজা আর আসেনই না, রাত্রে রাজা গৃহে আসিয়াই প্রায় শুইয়া পড়েন, রাণীর মৌন ভাব ভাঙ্গাইতে আর প্রয়াসই করেন না। একে ত রাণীর অভিমান, কষ্ট, রাজার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না, তাহার পর আবার রাজা নিজের ভাবেই সর্ব্বদা ভোর, আপনার কাছেই অন্যমন, সুতরাং অন্যের মানাভিমান ভাঙ্গিতে তাঁহার অবসরও নাই, সে কষ্ট তাঁহার বড় একটা চোখেও পড়ে না। রাজার যত অনাদর বাড়িতেছে, রাণীর কষ্টে রাজার ঔদাস্যভাব যত সুস্পষ্ট হইতেছে; রাণীরও কষ্ট সহিবার শক্তি তত বাড়িতেছে, তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণীয় তত

সবল হইয়া উঠিতেছে, স্বামীর কোলের কাছে শুইয়া তিনি ততই অবাধে নীরবে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে সক্ষম হইতেছেন।

দিন যাইতেছে, রাজা রাণীর বিষাদভাব দিন দিন প্রাসাদময় পরিব্যাপ্ত হইতেছে। রাজসভায় আর আগে-কার হাসি তামাসা নাই, রাজার বিষাদ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বিদূষকের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আর সাহস হয় না। অন্তঃপুরে সখীদিগের নৃত্য গীত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলের প্রাণেই কেমন অসুখ। প্রকাশ্যে রাজা রাণীর মনান্তরের কথা কেহ কয় না, কিন্তু গোপনে গোপনে সকলেই এই কথা লইয়া নাড়া চাড়া করে। পুরোহিত হরিতাচার্য্য এ সমস্ত নীরবে দেখিতেছেন, মহাদেবের নিকট তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা উঠিতেছে। প্রার্থ-নায় সবল হইয়া কখনো তিনি আশ্বস্ত হইতেছেন, কখনো নিরাশ হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছেন।

গণগৌরী উৎসবের দিন আগত প্রায়। অন্য বৎসরে এ সময়ে রাজবাটীতে কত আমোদ কত উল্লাস। এ বৎসর তাহার কিছুই নাই। উৎসবের উদ্যোগ হইতেছে, উল্লাস আমোদের একটা চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সকলের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ বহমান।

পূজার আগে অনুষ্ঠান-আয়োজনের বন্দবস্তের কথা কহিতে যে দিন হরিতাচার্য্য রাণীর সহিত দেখা করিতে

আসিলেন, তাঁহার সেই শুষ্ক বিবর্ণ যাতনা-পীড়িত মুখ দেখিয়া সে দিন তিনি চমকিয়া উঠিলেন—ভাবিলেন—রাজা কি ইহাঁকে দেখিতে পান না! এমন নিষ্ঠুর কে আছে, ইহাঁর এই কষ্টের মুখ দেখিয়া দ্রব না হইবে?

হরিতাচার্য্য তুমি অসংসারী, মনুষ্য-হৃদয় বুঝনা তাই এরূপ ভাবিতেছ। মহারাজ নিষ্ঠুর! অন্যের কষ্ট দেখিলে কি তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগে না? তিনি যদি দেখিতেন আর এক স্বামী তাহার স্ত্রীর উপর তাঁহারই মত ব্যবহার করিতেছে, তাঁহার হৃদয় কি মমতায় আর্দ্র হইত না? তিনি নিষ্ঠুর! আর একজনের সামান্য কষ্ট দূর করিতেও কি তিনি হৃদয় পাতিয়া দিতে পারেন না? তখন কি এই নিষ্ঠুরই সহৃদয়তার, আত্ম বিসর্জনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবেন না!

হায়! কে জানে সংসারে কে নিষ্ঠুর আর কে করুণাশীল! একই মানুষ যে জগতের পক্ষে করুণার আধার—অন্যের সম্পর্কে যাহার দিব্য চক্ষু, কিন্তু এক জনের সম্পর্কে সে এতই ঘোরান্ধ, যে তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্টেও সে হৃদয়ের একটি কণাও আর্দ্র হয় না। এমনি প্রকৃতি দিয়া মনুষ্য গঠিত, যে এই অস্বাভাবিকতাই মানুষের স্বাভাবিক, মানুষ নিষ্ঠুর নহে, বহুরূপী-তারের একটি যন্ত্র। তাহার যে রূপের তারে যখন ঘা পড়ে—সেই ভাবটি বাজিয়া উঠে। যে বাজায় তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করে, যে বাজাইবে তাহার বাজাইবার শক্তি থাকা চাই।

হরিতাচার্য্য রাণীকে যে সকল কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া আর কোন কথাই মুখ-নির্গত হইল না।

রাণী বলিলেন—“দেব, আপনাকে একটি কথা বলিতে ডাকিব ভাবিয়াছিলাম, না ডাকিতে নিজেই আসিয়াছেন।”

পুরোহিত বলিলেন—“কি কথা?”

রাণী। “আমি একবার সেই ভীলকন্যার সহিত দেখা করিতে চাই”।

হরিতাচার্য্যের মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল, কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া ইহার কারণ শুনিবার প্রত্যাশায় মহারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাণী বলিলেন “আপনি বলিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ বালিকাকে কলঙ্কের পথ হইতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বুঝিয়াছি তাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিতে আমি চেষ্টা করিব” —

পুরোহিত কি একটা কথা বলিতে গেলেন—কিন্তু তাঁহার কথা বাধিয়া গেল, তিনি থামিয়া পড়িলেন, রাণী বুঝিলেন, পুরোহিত বলিতেছিলেন, “রাজাকে সাবধান করাই ইহার প্রধান উপায়”—উত্তর স্বরূপ বলিলেন—“না রাজা মোহান্ধ, তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না, সেই বালিকার উপরই এখন সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আমার সঙ্গে একবার তাহার দেখা করাইয়া দিবার উপায় স্থির করুন।”

পুরোহিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, নিরাশা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, রাজার মতি যদি না ফেরে তবে আর ভরসা কোথা? কিছু পরে বলিলেন—"আচ্ছা কাল ভোরে একাকী তুমি আমার মন্দিরে যাইও তাহার দেখা পাইবে।"

ইহার পর পুরোহিত আর কোন কথা বলিলেন না— ভগ্নান্তঃকরণে আশীষ করিয়া মন্দিরে ফিরিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুজনে।

পরদিন ভোর না হইতে, ঘোর ঘোর থাকিতে থাকিতে রাণী মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার আগেই হরিতাচার্য্য স্নানে গিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মন্দিরে আর কেহই নাই, দীপালোক-প্রজ্জ্বলিত গৃহে একলিঙ্গদেব একাকী কেবল অধিষ্ঠান। মহিষীর দগ্ধ হৃদয়ের বেদনা যেন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, পিতার চরণে প্রণত হইয়া মহিষী অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন—"দেব দেখ দেখ, পিতা হইয়া কন্যাকে যে কষ্ট দিতেছ চাহিয়া দেখ। যদি কষ্ট দিয়াই,

তোমার সুখ হয়, দাও পিতা তাহাই দাও, তুমি সুখ দিয়াছিলে, এখন দুঃখই দাও, তোমার অভাগী সন্তানের এই মাত্র কেবল প্রার্থনা, যদি দুঃখ দিবে ত দুঃখ সহিবার বলও দাও, এ যন্ত্রণা বুঝি আর সহিতে পারি না প্রভু”।

কিছু পরে মন্দিরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহিষী মন্দিরের দ্বার ভিড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভৃত্য ফুলের সাজি হস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিল। রাণী শব্দ পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাণীকে দেখিয়া সে অভিবাদন করিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল—তাহার পর নীরবে ফুলরাশি মহাদেবের নিকটে রাখিয়া পূজার আয়োজন আরম্ভ করিল, মহিষী বুঝিলেন, হরিদাচার্য্যের আসিবার সময় হইয়াছে। মনে হইল, পুরোহিতের সঙ্গে এখনি ভীলকন্যাও আসিবে, তাঁহার নেত্রজল শুকাইয়া গেল। কেমন একটা ঔৎসুক্যময় আন্দোলনে তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি আস্তে আস্তে মন্দিরের পার্শ্বের গৃহে গিয়া বসিলেন। ভীলকন্যাকে না জানি কিরূপ দেখিবেন, তাহার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিবেন—এই সকল মনে আসিতে লাগিল। তাহার মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহাকে তিনি দূর হইতে সেই রাত্রে রাজার ক্রোড়ে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দেখা আসলে দেখাই নহে, তাহার মূর্ত্তি স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পান নাই। সম্ভবতঃ খুবই সুন্দরী! সম্ভবতঃ কেন—নিশ্চয়ই সুন্দরী! সকলেই

তাহার রূপের কথা বলে,—অবশ্যই রূপবতী, নহিলে রাজা মুগ্ধ হইলেন? কিন্তু রূপ থাকিলেই কি সকলে মুগ্ধ করিতে পারে? আর কি কাহারো· রূপ নাই—এমন ত রূপবতী আরো আছে—কিন্তু কেন তবে—? মায়াবিনী সে মায়া-বিনী?

রাজার কি দোষ? এত ভালবাসা—এত আদর—এত সব কি অমনি দুদিনে ভুলা যায়? এ সব কি মায়ার কর্ম্ম নহে, মায়াবিনী সে মায়াবিনী? তাহাকে তবে রাণী কি বুঝাইবেন? সে বুঝিবে কেন? রাণীর দুটা কড়া কথা—কি মিষ্ট কথা—কি উপদেশের কথা শুনিলে সে কি রাজাকে ছাড়িয়া যাইবে? রাজার ভালবাসা সে ছাড়িবে? তাহাতে উপকার কাহার? লাভ কাহার? তাহার না রাণীর?

রাণী আপনাকে বুঝাইয়াছিলেন—রাজার মঙ্গলের জন্যই তিনি সুহারকে বুঝাইতে আসিতেছেন, কিন্তু এখন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহাদের স্বার্থ দেখিতে গিয়া তিনি নিজের স্বার্থই খুঁজি-তেছেন। তাঁহার হৃদয়ের বল যেন তিনি হারাইতে লাগি-লেন। আশায় নিরাশায় উত্তেজিত, পীড়িত হইয়া রাণী বসিয়া রহিলেন, সহসা আবার মন্দির দ্বার খুলিয়া গেল, রাণী পার্শ্বের ঘর হইতে সৌৎসুকে দৃষ্টিপাত করিলেন, হরি-তাচার্য্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাহাকে বলিলেন—"মা

এস”। শুভ্র শতদলের মত বিকশিত মুখখানি লইয়া সেই উষালোক আলোকিত করিয়া সুহার মন্দিরে প্রবেশ করিল, রাণী অবাক হইয়া তাহার দি:কে চাহিয়া রহিলেন।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবী দর্শন।

সুহার বিকালে আর জলাশয়ের দিকে যাইত না বটে, কিন্তু প্রত্যূষে প্রায়ই নদীতে স্নান করিতে যাইত। রাজাকে দেখিবার এই তাহার সময় ও সুবিধা। অত ভোরে ক্ষে-তিয়া প্রায়ই আসে না, কোন কোন দিন আসিলেও তাহাকে ভয়ের কারণ নাই, কেননা সুহার ত মন্দির-ঘাটে স্নান করে না। সে যে আঘাটায় নামে, মন্দির ঘাট হইতে তাহা অনেকটা তফাতে। ইহার উপর আবার রাজাকে দূর হইতে মন্দিরঘাটে নামিতে দেখিলেই সুহার অমনি নদী হইতে উঠিয়া পড়ে। এমন কি সুহার এ বিষয়ে এতই সাবধান যে রাজা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন না সুহার প্রতি দিন তাঁহার এত নিকটে আসে। এ অবস্থায় লো-ককে তাহার কি ভয়? লোকে কি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুঝিবে রাজাকে মুহূর্ত্তের দর্শনের জন্যই সে রোজ নদীতে স্নান করিতে আসে, লোকে বরঞ্চ ভাবিবে রাজাকে

সে দেখিতে চাহে না। নহিলে তাহাকে দেখিবা মাত্রেই কেন সে ঘাট হইতে উঠিয়া পড়ে।

বালিকার 'লোক' আর কেহই নহে, এক ক্ষেতিয়া। সে জানে একমাত্র ক্ষেতিয়ার লক্ষ্যের উপরেই সে রহিয়াছে, তাহার লক্ষ্য এড়াইলেই সে সংসারের লক্ষ্য এড়াইল, সুতরাং ক্ষেতিয়াকে ভুল বুঝানই তাহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছিল; সত্যই বালিকার এই সতর্কতায় ক্ষেতিয়া ফাঁকিতে পড়িয়াছিল। রাজাকে দেখিলে সুহার যতই পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, ক্ষেতিয়া মনে মনে ততই আহ্লাদিত হইত, সে ভাবিত নিশ্চয়ই ঔষধের গুণ ধরিয়াছে। সুহার ইহাতে জিতিয়াছিল, কিন্তু একটি সে বড় ভুল করিয়াছিল—সে যে মনে করিত সংসারে একমাত্র ক্ষেতিয়া ছাড়া তাহাকে আর কেহ লক্ষ্য করে না তাহা ঠিক নহে, আরও এক জন প্রতিদিন তাহার নদীতীরে আগমন লক্ষ্য করিতেন, ইনি হরিদাচার্য্য। সেই জন্যই তিনি রাণীকে প্রাতঃকালে তাঁহার মন্দিরে আসিতে বলিয়াছিলেন।

পুরোহিত সে দিন অন্য দিন অপেক্ষাও প্রত্যূষে স্নানে গমন করিলেন, কিন্তু মন্দিরঘাটের পরিবর্ত্তে সুহার যে আঘাটায় নামিত সেইখানে নামিলেন। সুহার যখন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার স্নান পূজা শেষ হইয়াছে, তিনি কেবল সুহারের জন্যই তখনো নদী হইতে

উঠেন নাই। তাহাকে দেখিয়া তিনি জল হইতে উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন "মা তুমি মন্দিরের এত নিকটে স্নান করিতে এস, কই একদিনও ত দেব দর্শনে আস না" ?

বালিকা একটু জড় সড় হইয়া পড়িল, কোন উত্তর করিল না, কিন্তু হরিতাচার্য্যের সেই প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই করুণ স্নেহের স্বর তাহার হৃদয়ে একটা ভক্তির ভাব সঞ্চারিত করিল। হরিদাচার্য্যও তাহাকে এত নিকটে পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহার সেই সরল সুন্দর বালিকা মূর্ত্তি দেখিয়া একটি অতি সুকোমল স্নেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি আবার বলিলেন "আজ একবার মন্দিরে তোমাকে যাইতেই হইবে। সেখানে দেব প্রণাম করিবে, আর দেবী দর্শনও পাইবে। এস মা আমার সঙ্গে"।

বালিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"স্নান না করিয়া দেব প্রণাম করিব ?

হরিদাচার্য্য একটু হাসিয়া বলিলেন "তাহাতে ক্ষতি নাই, দেবতাগণ সকল সময়েই প্রণম্য"।

বালিকা তখন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ভীল-পালিত বলিয়া হিন্দুর দেবভক্তি হইতে তাহার হৃদয় বঞ্চিত হয় নাই। কেন না ক্ষত্রিয়দিগের সংসর্গে আসিয়া ভীলগণ নিজেই ক্ষত্রিয়দিগের দেবতাকে মাননা করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মাননা ও সুহারের ভক্তি সম্পূর্ণ

ভিন্ন ভাব হইতে উত্থিত হইত। নদীতীরে আসিয়া মহাদেবের স্তব শুনিলে ক্ষেতিয়া বলিত—"সুহার ঐ মন্দিরের দেবতা বড় মস্ত দেবতা, শাল্‌ গাছেরই মতন, কিন্তু পাঁটা বলি নেয় না, এইটিতেই কেমন লাগে, তা নাই নিক— প্রণাম হই—আজ যেন মোর শীকার মেলে।"

কিন্তু সুহারের কর্ণে যখন দেববন্দনা আরতিধ্বনি প্রবেশ করিত, তাহার হৃদয় রোমাঞ্চিত ভক্তিদ্রব হইয়া উঠিত, তখন কোন প্রার্থনা কোন ভিক্ষা তাহার মনে উদিত হইত না, এক প্রেমময় ভাবের স্পর্শ সে শুধু অনুভব করিত, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দমাত্র তাহার হৃদয় অধিকার করিত। পরে অনেক সময় সে সেই দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত, তাঁহাকে পূজা করিত, তাঁহাকে মনের কথা কহিত। কিন্তু দূর হইতে মন্দিরের উথলিত বন্দনা গীতি শুনিলে তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পরিপূর্ণ হইত, তাহার দেবতার সহিত তাহার নিজের সহিত কোন স্বাতন্ত্র্য যেন আর সে বুঝিতে পারিত না, সমস্তই একটা গভীর আনন্দে মাত্র একাকার হইয়া যাইত। সে যখন পুরোহিতের অনুগামী হইল, তখন তাহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, দূর হইতে যাঁহার বন্দনা গীত শুনিয়া হৃদয় সার্থক করে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিবে, তাঁহার মন্দিরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার বন্দনা শুনিয়া তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিবে, এরূপ সৌভাগ্য সে কথনো কল্পনাও করে

নাই। সে ভক্তি উথলিত হৃদয়ে মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল, পুরোহিত পূজার আরতি আরম্ভ করিলেন—ধূপ ধূনার গন্ধ, শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি, স্তোত্র ধ্বনি উঠিতে লাগিল, মন্দির সুগন্ধে, সুরবে, সুমঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সুহার সেই প্রস্তর মহাদেবের মধ্যে অনন্ত জগতের অনন্ত মঙ্গল আত্মা প্রত্যক্ষ করিল, কতক্ষণ আরতি হইল সুহার জানে না, সে যখন প্রণাম করিয়া উঠিল, দেখিল মন্দির নিস্তব্ধ। সে উঠিয়া দাঁড়াইলে হরিতাচার্য্য বলিলেন—"বৎসে, এইবার দেবী দর্শনে চল?"

মহিষী পাশের ঘরে বসিয়াই আরতির সময় দেব প্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি আর এ ঘরে আসেন নাই, সুহারকে সঙ্গে লইয়া হরিতাচার্য্য সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। বালিকা বিস্ময় দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল—এক জীবন্ত সৌন্দর্য্য প্রতিমা! ইনি কোন্ দেবী! বালিকা ত্রস্তে তাঁহার নিকট প্রণত হইল। হরিতাচার্য্য বলিলেন—"বৎসে ইনি ইদরের রাণী, মহারাজ গ্রহাদিত্যের মহিষী তোমরা দুজনে কথাবার্ত্তা কও, আমি অন্য গৃহে যাই।"

বলিয়া হরিতাচার্য্য চলিয়া গেলেন। বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বালিকা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

সুহারকে ভীত দেখিয়া রাণী কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"ব'স ভদ্রে ব'স, রাণী শুনিয়া ভয় পাইও না, আমাকে বোন বলিয়া মনে জানিও।"

রাণী বিস্মিত সুহারের হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কিন্তু রাণীর সেই সাদর ব্যবহারে সাদর বাক্যে সুহার আরো যেন ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার সুন্দর মুখ খানি সভয়ে বিস্ময়ে বড় সুন্দর হইয়া উঠিল, তাহার সুগঠিত তনুদেহে, মধুর সুশ্রী মুখে লজ্জাবতী লতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। রাণী তাহার দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেলেন সে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভুলিয়া গেলেন সে-ই তাঁহার কষ্ট দুঃখের কারণ। তাহার সেই ভয়সঙ্কুচিত মুখে তাহার বালিকা হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রেম রহস্য তিনি উদ্ঘাটিত দেখিলেন, রাগ দ্বেষের পরিবর্ত্তে একটা কোমল কৌতূহলে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ইহারি মত বয়সে, এইরূপ প্রথম যৌবনে তিনি যে ইহারি মত প্রেমের সর্ব্বাঙ্গ বিকশিত ছবির আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, এই বালিকাতে সেই ছবিই তিনি দেখিতে লাগিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগিনি, তোমার নাম কি?"

সুহারের নাম যে তিনি জানিতেন না তাহা নহে—তবে এ জিজ্ঞাসা কেবল কথা আরম্ভ করিবার একটা উপায় মাত্র। সুহার আস্তে আস্তে বলিল—"সুহার"

রাণী বলিলেন—"সুহার? কিসের? অবশ্য ফুলেরি হইবে—নহিলে নামটি খাটে না। হারটি হৃদয়ে রাখিবারই যোগ্য। তবে কি জান ভাই, ফুল-যে তাহার হার না হইয়া ফুল থাকাই ভাল। ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটিয়া গন্ধ বিকীর্ণ করে ততক্ষণই তাহার সুখ—ততক্ষণই তাহার আদর। হার হইয়া যদি একবার মানুষের গলায় পড়িল—ত অমনি ম্লান হইয়া গেল। মানুষ কি ভাই ফুলের মর্য্যাদা বোঝে?"

বালিকা লাল হইয়া উঠিল। রাণী আবার হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষতঃ রাজা রাজড়াদের কাছে ফুলের আদর নেহাৎ কম। ফুল পাইলে ছিঁড়িযাই তাঁদের আমোদ। সোনার হার কি পাথরের হার হইলেই তাঁদের কাছে টেকে। তোমাকে যখন বোন বলিয়াছি—তখন আর লুকাইব কেন—এই যে আমাকে দেখিতেছ—একদিন কত যত্ন করিয়া রাজা গলায় পরিয়াছিলেন, আজ টানিয়া দূরে ফেলিয়াছেন"—

বালিকা কাঁপিয়া উঠিল—ভাবিল এত কথা সমস্ত তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। রাণী হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তবে কি না আমি সোণার হার—স্বর্ণে কলঙ্ক

নাই—স্বর্ণ ম্লান হয় না—তাই ফেলিয়া দিলেও আমি নিজের গৌরবে নিজে আছি—কিন্তু তুমি যেরূপ ফুলটি তোমার উপর যদি রাজার হাত পড়িত—ত একবারেই মলিন হইয়া যাইতে।"

বালিকার লালমুখ নত হইল—ঠোঁট সুস্পষ্ট কাঁপিতে লাগিল। রাণী বলিলেন—"বুঝিয়াছি—তুমি বলিতেছ—গলায় থাকিয়া শুকাইতেও কি সুখ নাই? আছে, যদি গলায় থাকা যায়। কিন্তু কণ্ঠে উঠিয়া আবার যদি সেখান হইতে মাটীতে পড়িতে হয় ত তাহার চেয়ে কি আর দুঃখ আছে? তুমি ভাবিতেছ তা কি কেউ ফেলিতে পারে? পারে না? আমি ত একদিন গলায় ছিলাম—তবে আমার এ দশা কেন"?

বালিকার নত চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, কিন্তু পড়িল না,—তাই রাণী দেখিতে পাইলেন না—তিনি বলিলেন—"তবে আমি ত বলিয়াছি—আমি সোনার হার অর্থাৎ আমি বিবাহিত। কিন্তু মনে কর তোমাকে যদি কেহ ভাল বাসিয়া গলার হার করিতে চায় অথচ বিবাহ না—

বালিকা আর পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। রাণী দেখিলেন তাহার মনে আঘাত দিয়াছেন, এরূপ করিয়া বলিয়া ভাল করেন নাই, রাণী ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—

"আমার কথায় কি তোমাকে কষ্ট দিতেছি বোন!

যদি আমার হৃদয় দেখিতে ত বুঝিতে কষ্ট দিবার ইচ্ছায় আমি তোমাকে কোন কথা বলিতেছি না। তোমাকে কষ্টের পথ হইতে দূরে রাখাই আমার ইচ্ছা। তোমার অন্ধ নয়ন মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার সঙ্কল্প। ভগিনি, আমি জানি তুমি কাহাকে ভালবাস, কিন্তু তুমি যে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিবে না তাহা হয়ত তুমি জান না, তাঁহার সংস্রবে কেবল তোমাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাইতেছে, স্ত্রীলোকের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে নাম—যথাসর্ব্বস্ব যে ধর্ম্ম সেই নাম সেই ধর্ম্ম”—

বালিকা কাঁদিয়া রাণীর হাত ধরিল। হাত ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল—“দেবি—সত্যই কি তবে আমি কলঙ্কের পথে যাইতেছি? তাঁহার—তাঁহার ভালবাসা কি সত্যই অপমান? ক্ষেতিয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি না—কিন্তু আপনিও যে উহা বলিতেছেন!”

রাণী আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহারও নেত্র জল পূর্ণ হইল। বালিকা আবার বলিল “দেবি—সত্যই আমি ভালবাসি। নিজের অপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু আমার গৌরবকে আমার ধর্ম্মকে তাঁহা হইতেও অধিক ভালবাসি, এ গৌরব বিনষ্ট হইলে আমার পিতা মাতার অপমান হইবে—আমার অন্তর-দেবতার অপমান হইবে—আরো আরো আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব—যাঁহাকে আমি ভালবাসি তাঁহারও অপমান হইবে, এ গৌরব নষ্ট হইলে আমি

তাঁহাকে ভালবাসিতেও অধিকারী নহি। আমি আর তাঁহার সহিত দেখা করিব না”।

রাণী আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—দুই জনে দুইজনের হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় হরিতাচার্য্য আসিয়া বলিলেন, “বৎসেরা মহারাজের স্নানে আসিবার সময় হইয়াছে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও পুরোহিত।

সুহারকে জল হইতে উঠাইবার পরদিন সন্ধ্যাকালে আবার রাজা সেই তরুকুঞ্জে আগমন করিলেন।

আজ তেমনি চাঁদ উঠিয়াছে; বন প্রদেশে, জলাশয়ে তেমনি স্তব্ধ জ্যোৎস্নার তরঙ্গ বহিতেছে, মহারাজ একাকী তীরে আসিয়া বসিয়াছেন, চারিদিক উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন, কেমন চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন—সব আছে, তবু যেন কিছু নাই! কেবল পূর্ব্বদিনের সেই স্মৃতি সেই মূর্ত্তি, সেই স্পর্শ তাঁহার বাসনারুদ্ধ হৃদয় আলোড়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ থাকিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন, মনের সহস্র কথা প্রাণের নৈরাশ্য ব্যথা প্রাণেই রহিয়া গেল। পর

দিন আবার সেই সময়ে আশায় নিরাশায় বিকম্পিত হইয়া নিকুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আজও চারিদিক শূন্য, মহা-শূন্য—আজও কোথাও কেহ নাই, মহারাজ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তরুলতার ঝর ঝর শব্দ, জলা-শয়ের মৃদু হিল্লোল, বন ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ, চাঁদের মধুর হাসি শুধু কেবল তাঁহার প্রাণে অভাব জাগাইতে লাগিল—একটা আকুলতাময় অভাব—একটা বেদনাময় তীব্র অতৃপ্তির মধ্যে তিনি আত্মহারা হইলেন। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল, গভীর রাত্রে সুগভীর নৈরাশ্য বেদনা লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

শয্যাতে শুইয়াও তাহার কথা মনে পড়িতে লাগিল—পরদিন দেখা পাইবেন কি না সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল—তাঁহার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিলেন, পাশে সেমন্তী যে কি অসীম জ্বালায় মুমূর্ষু তাহা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না।

এইরূপে প্রতিদিন কাজে কর্ম্মে, বিশ্রামে অবসরে কেবল একজনেরি কথা তাঁহার মনে জাগিতে থাকে—প্রতি সন্ধ্যায় তিনি হৃদয়পূর্ণ সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিকুঞ্জে আগমন করেন, আবার সেই আকুল নিরাশা লইয়া গভীর রাত্রে প্রাসাদে ফিরিয়া যান। প্রতি দিন এইরূপ অভিনয় চলিতে লাগিল। রাজার আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই—তাঁহার উন্মত্ত হৃদয়

সুহারের চরণে উপহার দিবার জন্য রাজা উন্মত্ত। রাজা কেবল ভাবিয়া আকুল, কিরূপে তাহার একবার দেখা পাইবেন।

রাজা নিকুঞ্জে সেই গাছের তলে যেখানে সুহারকে নামাইয়াছিলেন—সেইখানে দাঁড়াইয়া কেবল উহাই ভাবিতেছিলেন। এইরূপেই কি দিন যাইবে—প্রতিদিন এই পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া কি কেবল শূন্যকে উপহার দিতে আসিব? আবার নিরাশভাব বহন করিয়া একাকী ফিরিয়া যাইব? দিনের পর দিন যাইবে, আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কি কখনো পূর্ণ হইবে না, এই আকুল উন্মত্ততা সত্যই কি উন্মাদের কল্পনাতেই বিলীন হইবে? ইহার কি প্রতিকার নাই? কেন এ সঙ্কোচ? যাহাকে হৃদয় দিয়াছি—সর্ব্বস্ব দিয়াছি—হৃদয়ের রাণী করিয়াছি তাহাকে সিংহাসনের রাণী করিতে সঙ্কোচ? এই জন্য সমস্ত জীবনের সুখ শান্তি কি লোপ করিব?"

এই সময় কাহার পদশব্দ শোনা গেল—রাজা চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন—হরিদাচার্য্য আসিতেছেন। হরিদাচার্য্য নিকটে আসিলে তিনি মৌণে অভিবাদন করিলেন। হরিদাচার্য্য আশীষ করিয়া বলিলেন—"বৎস তোমাকে গোপনে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি—সভায় লোকজনের সাক্ষাতে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে না। শুনিতেছি গণপতিকে তুমি আমার পরিবর্ত্তে

পুরোহিত করিবে, প্রাসাদের পশ্চাতে ঐ জন্য নূতন মন্দির হইতেছে?”

গ্রহাদিত্য মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক হইলেন—হরিদাচার্য্যের প্রতি তিনি যতই বিরক্ত হউন না কেন এখনো তাঁহাকে সন্তানের দৃষ্টিতে দেখিতেন—মহৎ লোকের একটি গম্ভীর আকর্ষণী ভাব আছে তাহার হাত হইতে সহজে লোকে আপনাকে সরাইয়া লইতে পারে না। একটু পরে বলিলেন—“ঠাকুর গণপতিকে নূতন মন্দিরের পুরোহিত করিতেছি সত্য। কিন্তু আপনার পরিবর্ত্তে নহে, আপনি যেমন আছেন তেমনিই থাকিবেন। আপনার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেই বা আমার অধিকার কি?”

হরিদাচার্য্য একটু হাসিয়া বলিলেন—“অধিকার নাই থাকুক, যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমি তোমাকে অধিকার দিয়া নিজেই বিদায় গ্রহণ করিব, কেবল কিছুদিন মাত্র তোমারি মঙ্গলের ইচ্ছায় আমার পৌরোহিত্য রাখিতে ইচ্ছা করি। ভগবান করুন, যে তাহার পর তুমি নিজে আমার এই অধিকার অন্যকে দান করিতে পার। কিন্তু যতদিন সে দিন না আসে আমার পদ আমি ত্যাগ না করি, ততদিন বৎস আমার অধিকার পূর্ণ মাত্রায় যেন ভোগ করিতে পাই, তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু আমার কর্ত্তব্য—তাহা পালনে আমাকে যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়,

তোমার বিরক্তির ভয়ে তোমাকে মঙ্গল উপদেশ দিতে যেন পরাঙ্মুখ না হই।”

রাজা বুঝিলেন—কোন একটা উপদেশের ইহা পূর্ব্ব সূচনা, বড়ই বিরক্তি বোধ হইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। পুরোহিত বলিলেন—“বৎস কোন কারণে আমি কিছু দিনই দূরে থাকিবনা, গণগৌরী পূজা হইয়া গেলে তখন ফিরিয়া আসিব। যাইবার আগে আর এক-বার বলিয়া যাই,বৎস, সম্মুখে নিতান্তই অমঙ্গল, তুমি জাগ্রত না হইলে উপায় নাই।”

রাজা বলিলেন—“আপনি ত ক্রমাগতই অমঙ্গল কল্পনা করিতেছেন, ইহাতে যতক্ষণ না জাগ্রত হই ততক্ষণই কি মঙ্গল নহে?—অমঙ্গল সত্যই যদি ঘটে তখন তাহার ভোগ ত আছেই—এখন হইতে তাহার কল্পনায় জীবনকে কেন বিভীষিকাময় করা?”

পুরোহিত। মহারাজ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, আমিও তাহা বুঝি, কিন্তু আগে হইতে সতর্ক হইলে এই অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়’।

রাজা। কিন্তু কি অমঙ্গল তাহা যদি জানি তবে ত রক্ষা পাইব? আপনি অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলেরই উল্লেখ করিয়া আমাকে ব্যস্ত করিতে চান। কি অমঙ্গল হইতে আমাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহা কি বলিয়াছেন?”

পুরোহিত। “বিদ্রোহের একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে”।

রাজা। ও কথা যদি বলেন ত সে লক্ষণ আর কেহ দেখিতেছে না, অন্ততঃ আমি ত দেখিতেছি না ?"

পুরোহিত। তোষামোদ পূর্ণ রাজসভায় বসিয়া তুমি তাহা কিরূপে দেখিবে ? কিন্তু আমি দেখিতেছি ভীলগণ দিন দিন অশান্ত, অসন্তুষ্ট হইতেছে।"

রাজা। তা যদি হয়—ত বিনা কারণে হইতেছে, আমি এমন কিছুই কাজ করি নাই যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে—সুতরাং যাহার কারণ নাই—তাহার কারণ দূর করা অসম্ভব। লোকে যখন নিজের দোষে কষ্ট পায় তখন দেবতাকে ঈশ্বরকে গালি দেয়, কিন্তু সে গালি কি তাঁহাতে স্পর্শে ? আমি যদি নির্দ্দোষী হই ত তাহাদের অসন্তোষে কিছু মনে করি না।"

পু। "মহারাজ সত্য কথা, দুঃখ কষ্ট আমাদের মনের দোষ। কিন্তু সে জন্য বিধাতাকে দোষী করা পিতার উপর পুত্রের অভিমান, এই অভিমানের অর্থ দুঃখ-দূরের প্রার্থনা। সে অভিমান সে প্রার্থনা বিধাতা না শুনিলে কে শোনে। বুঝিলাম প্রজারা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছে—কিন্তু তাহাদের দুঃখ তুমি না শুনিলে কে শোনে" ?

রাজা। যদি সত্যই তাহাদের কোন দুঃখ থাকে আমি শুনিতে অনিচ্ছুক নহি—কি বলিতে চান আপনি বলুন।"

হরিদাচার্য্য একটু নীরব হইলেন—তাহার পর বলি-লেন—"মহারাজ ভীল কন্যাকে ভালবাসা"—

সেই পুরাতন কথা! রাজা বুঝিলেন হরিতাচার্য্য নিজের মন হইতে কথাটাকে নিতান্ত ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। সত্য সত্য এ কথার মধ্যে যে একটা কিছু বিপদ আছে তাহা ভাবিলেন না। পুরোহিত কথা শেষ না করিতেই তিনি বলিলেন—"দেব আমার সব সহে—কিন্তু আমি কাহাকে ভালবাসি না বাসি আমার মনের কথা লইয়া টানাটানি করা আমার সহে না। আমার নিজের মনের কথা—সে রাজার কথা নহে, তাহার সহিত প্রজার কোন সম্বন্ধ নাই—আছে কি?

পু। একটু আছে। ভীলকন্যা প্রজার কন্যা এটা ভুলিও না। তুমি রাজা তুমি রক্ষক—কেহ বিপথে পড়িলে তাহাকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম্ম, কিন্তু ভীলেরা ভাবিতেছে তুমি তাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিপথে লইয়া যাইতেছ।" ক্ষেতিয়ার কথা হইতে হরিতাচার্য্যের এইরূপ মনে হইয়াছিল।

পুরোহিতের কথা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, একটা সত্য-দ্বার তাঁহার কাছে খুলিয়া গেল—লোকে এরূপও ভাবিতে পারে। তথাপি তিনি রাগিয়া বলিলেন "রাজার রাণী হওয়া একজন ভীলকন্যার কলঙ্কের কথা?"

পু। "কিন্তু তাহা হইবে না। সে ভীল তুমি ক্ষত্রিয়।"

রাজা। "সে সঙ্কোচ আমার পক্ষে—ভীলের পক্ষে নহে—আমি যদি তবু ও—"

পু। "তাহা তুমি পার না—সে বিবাহ ধর্ম্ম বিবাহ হইবে না—তাহাতে তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না।"

রাজা। যদি কলঙ্ক হয় সে কলঙ্ক আমার, ভীলদিগের তাহাতে কলঙ্ক নাই।"

ক্ষুদ্র প্রজারো আত্মসম্মান রাজার সম্মান হইতে যে ন্যূন নহে তাহা রাজা ভুলিয়া গেলেন, তিনি বড় লোক তাঁহার সম্মানে সকলে সম্মানিত এই মাত্র তখন তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ তাহা নহে তুমি রাজা তুমি বড় লোক, তোমার কলঙ্ক লোকে দেখিবে না। কিন্তু ভীলগণ সামান্য হইলেও ইহাতে আপনাদিগকে কলঙ্কিত বিবেচনা করিবে। মহারাজ আপনাকে আপনি ভুলিও না—প্রবৃত্তিকে দমন কর।"

মহা। "আমার ভাবনা আমি নিজে ভাবিব, আপনার সেজন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।"

মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ পাগল হইয়াছ—একটু বুঝিয়া দেখ কি ভয়ানক কার্য্য করিতেছ, কেবল প্রজাদের ক্ষতি নহে,—আপনার রাজ্য জীবন সমস্ত খোয়াইতে বসিয়াছ।"

মহা। "আমি কি চিরকাল মুখোষের ভয় পাইব, এখন

আমি বালক নাই ইহা হয়ত আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন।” মহারাজ ত্রস্তে বিদায়-অভিবাদন করিয়া বাড়ীর দিকে পদক্ষেপ করিলেন—পুরোহিত কাতর হইয়া বলিলেন “গ্রহাদিত্য, গ্রহাদিত্য, তোমার মৃত্যু তুমি নিজে আহ্বান করিয়া আনিতেছ” !

বলিতে বলিতে দেখিলেন মহারাজ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন—হরিতাচার্য্য থামিলেন। কাতর নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“ভগবান তোমার লীলা বুঝা ভার ! অদৃষ্টের চক্র তোমার হাতে—তাহাকে রোধ করিতে চেষ্টা করা মানুষেব বৃথা পরিশ্রম, তঁবু আমরা না বুঝিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া মরি ! কাহার দোষে কাহাকে তুমি শাস্তি দাও তুমিই জান ! পিতার দোষে পুত্রের শাস্তি ! একের পাপে অন্যের প্রতিফল ! মন্দালিকের বধের শাস্তি বুঝি আজ নাগাদিত্যকে বহন করিতে হয়” !

হরিদাচার্য্য ব্যথিত-চিত্তে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দিবস নাগাদিত্যের আসন্ন বিপদ খণ্ডন-কামনায় নির্জ্জনে ধ্যান স্বস্ত্যয়নে অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া সেই দিনই মন্দিরপুর ত্যাগ করিলেন। তাহা ছাড়া আর অন্য উপায় দেখিলেন না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মূর্চ্ছা।

রাণী পূর্ব্বে আর কখনো রাজাকে লুকাইয়া কোন কাজ করেন নাই, সুহারকে রাজার সহিত দেখা করিতে নিরস্ত করা তাঁহার এই প্রথম এইরূপ কাজ, সুতরাং যতই কর্ত্তব্য জ্ঞানে নীত হইয়া এই কার্য্যে উত্তেজিত হউন না কেন—কার্য্য শেষ হইবার পর হইতেই তাঁহার মনে কেমন একটা অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠিল—সত্য সত্য কাজটা ভাল করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে তখন তাঁহার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল, রাজার মঙ্গল উদ্দেশ্যেই যদিও এরূপ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন—পাছে রাজা মোহান্ধ হইয়া এক-জন অজ্ঞান বালিকাকে বিপথে লইয়া যান—তাঁহাকে অন্যায় পথ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই যদিও অন-ন্যোপায় হইয়া প্রথমে তাঁহার এই সঙ্কল্প মনে উদিত হয় কিন্তু এখন তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—নিজের স্বার্থের জন্যই কি তিনি এ সমস্ত করেন নাই? বাস্তবিক কি রাজা এইরূপ অন্যায় কাজ করিতেন? তাঁহাকে এত-দূর অবিশ্বাস করা—তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি এতদূর সন্দেহ করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? রাজা হয়ত বিবাহের আশা করিয়াই সুহারকে ভালবাসেন, সুহার যে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না—ইহা হয়ত তিনি জানেন না;

এ কথা হয়ত তাঁহার মনেই আসে নাই, কেহ তাঁহাকে ইহা বলিতেও হয়ত ভরসা করে নাই। এরূপ জানিলে রাজা নিজেই হয়ত সাবধান হইতেন, রাজাকে সাবধান না করিয়া তিনি কি না সুহারকে সরাইবার চেষ্টা করিতে-ছেন—স্বামীর কল্পিত সুখের পথে লুকাইয়া লুকাইয়া কণ্টক অর্পণ করিতেছেন"! এ সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই রাণীর হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল—তিনি ভাবিলেন—"রাজা যদি সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারেন তিনি না জানি কি মনে করিবেন? তিনি কি ভাবিতে পারেন না ঈর্ষাপরবশ হইয়া নিজের সুখের জন্যই আমি সুহারকে আমার পথ হইতে সরাইতে চেষ্টা করিয়াছি! প্রকৃত পক্ষে ইহাই কি ঠিক নহে? নিজের সুখের জন্যই কি আমি লালায়িত নহি"?

রাণীর মনে হইতে লাগিল, তিনি নিজের স্বার্থের জন্যই সমস্ত করিয়াছেন,—রাজার জন্য যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন, সে কথা একেবারে অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহার মঙ্গল করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে শেষে মনে যে স্বার্থের কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সেই স্বার্থই তাঁহার কার্য্যের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিলেন, অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, রাজার নিকট নিজের অন্যায় প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কেবল কিরূপ করিয়া বলিবেন—

এই সঙ্কোচে নিতান্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন। বলিবার আজকাল তেমন সুবিধাও ঘটে না, রাজা অধিক রাত্রে আসেন, ভোরে উঠিয়া যান—নিজে হইতে প্রায় কথাবার্ত্তা করেন না,—এরূপ অবস্থায় কি করিয়া এ সব কথাই বা তোলেন! এই নূতন কষ্টে অন্য গুরুতর কষ্টও তাঁহার মনে লঘু আকার ধারণ করিল।

এ দিকে গণগৌরী পূজার উৎসব আগত প্রায়, চৈত্র মাস পড়িয়াছে ১০ই চৈত্র সমরাত্র-দিবার দিনে কৃষক-দিগের নূতন-শস্য বপন আরম্ভ হইল—চারিদিকে বসন্তের হিল্লোল, শষ্য বপনের ধূম। এই দিনে প্রতি সামান্য কৃষক ঘরণীও স্বহস্তে একটি ক্ষুদ্র স্থান খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস সেই অঙ্কু-রিত বীজ প্রিয়তমের অঙ্গরক্ষক হইলে সম্বৎসর তাহাকে সমস্ত বিপদ হইতে দূরে রাখিবে—সেই উদ্দেশে অগ্নির উত্তাপে তাহারা বপিত বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিতে করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

রাণীও সহচরীদের সহিত শষ্য বপন করিলেন, গান, বাদ্যের মধ্যে বীজ বপিত হইল, সেই আমোদের মধ্যে রাণীর মুর্ত্তি একটি শোকের ছায়া বোধ হইতে লাগিল।

দু চারিদিনে বীজ অঙ্কুরিত হইল, রাণী তাহা রাজাকে উপহার দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—অনেক রাত্র হইয়া গেল, দেখিলেন মহারাজ তখনো অন্তঃ-

পুরে আসিতেছেন না—রাণী আর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই তাঁহার বিরাম গৃহে গমন করিলেন। রাজা সবে মাত্র নিকুঞ্জ হইতে আসিয়া পালঙ্কে শুইয়াছিলেন, রাণী তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝি রাজার চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়িল, তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। গৃহের বাতায়ন মুক্ত, সুতরাং বাহিরের জ্যোৎস্না অল্প অল্প গৃহে আসিয়া পড়িয়াছিল, দীপও জ্বলিতেছিল, সেই মিশ্রিত আলোকে দুজনের বিষণ্ণ মলিন মুখ দুজনের চোখে পড়িল, দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন;—দুদিনে কি পরিবর্ত্তন! আজ কেহ কাহাকে দেখিয়া কথা খুঁজিয়া পায় না, মনের কথা মনে থাকে, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে মিলায়! মহিষী আস্তে আস্তে বলিলেন "মহারাজ তোমাকে অঙ্কুর পরাইতে আসিয়াছি"—

রাজা বলিলেন—"ওঃ আজ অঙ্কুর পরিবার দিন, ভুলিয়া গিয়াছি। রাজা উঠিয়া বসিলেন, শয্যার উপর রাজার মুকুট পড়িয়াছিল—রাণী তাহাতে অঙ্কুর বাঁধিয়া রাজার মাথায় পরাইয়া তাহার পর রাজা না বলিতেই পালঙ্কের এক পাশে বসিলেন। রাজা একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন, রাজার মনে হইল কোন একটা কথা কহা দরকার, কিন্তু কোন কথা যেন তাঁহার জোগাইতেছিল না—তিনি একবার ঢোঁক গিলিয়া একবার গোঁপে তা দিয়া অবশেষে বলিলেন—

"আঃ দিনটা কি গরম!" মহিষীর গাল বাহিয়া ধীরে

ধীরে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, এখনকার এই সম্ভাষণ! এখন আর রাজা কথা খুঁজিয়া পান না!

কিন্তু রাজার এই ব্যবহারে তাঁহার হাসিও আসিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ মহারাজ! এখন ঠাণ্ডা হইবারও বিশেষ সুযোগ দেখিতেছি না—আমি জ্বালাইতে আসিয়াছি"—

এই কষ্টের মধ্যেও ঠাট্টা করিবার ভাব রাণী অতিক্রম করিতে পারিলেন না—বোধ করি ইহা রমণী স্বভাব। হয়ত নিতান্ত নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার ভাব যেখানে থাকে সেইখানে এ বিদ্রূপ স্বাভাবিক, বুঝি ইহার পরিবর্ত্তে একটা আদরের কথা একটা ভালবাসার আশ্বাসের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।

কথাটার সত্যতা রাণীর কথাতেই রাজা অনুভব করিলেন, কিছু উত্তর করিলেন না।

রাণী আবার বলিলেন "ইচ্ছা করে জ্যোৎস্না খানা আনিয়া প্রাণটা তোমার ঠাণ্ডা করিয়া দিই।"

রাজা একথায় রাগ করিলেন না—একটু শুধু উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন—তাঁহার সেই জ্যোৎস্না মনে পড়িল, জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না মনে পড়িল, তিনি যেন সহসা আর সব ভুলিয়া গেলেন। দৃষ্টি সহসা যেন থমকিয়া গেল—একটা অলস উদাস ভাব ছাড়া সে দৃষ্টিতে আর কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। ধীরে ধীরে রাণীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল,

বুঝিলেন—কিছুতেই আর তাঁহার ধন তাঁহার হইবার নহে, নিতান্ত আপনার লোক একবার পর হইলে বুঝি আর আপনার হইবার আশা থাকে না। তাঁহার বিদ্রুপের ভাব দূর হইল, একটা মর্ম্মভেদী কষ্ট মাত্র তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন—"মহারাজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব—বলিবে কি ?"

রাজা বলিলেন—"কি কথা !"

রাণী অনেকক্ষণ থামিয়া থামিয়া অনেক কষ্টে বলিলন—"তুমি ভীল কন্যাকে বিবাহ করিতে চাও" ?

যদি কোন কথা রাজা রাণীর সহিত কহিতে না চান—ত সে ভীল কন্যার কথা। রাজা স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বলিলেন—"এ আবার কে বলিল—?"

রাণী বলিলেন—"কেহ বলে নাই, কিন্তু আমার মনে হয় লোকে এইরূপ ভাবে,"—

রাজা বলিলেন—"লোকে কি ভাবে তাহার উত্তর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন ? তাহারা ত আমার সহিত পরামর্শ করিয়া ভাবিতে যায় না—তাহাদেরি ত জিজ্ঞাসা করিতে পার"—

রাণী বলিলেন—"না তাহাদের আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তোমাকেও কেন জিজ্ঞাসা করিলাম জানি না—আমি শুধু বলিতে আসিয়াছি—শুনিতেছিলাম ভীলকন্যা নাকি তোমার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না"—

রাজা। "সে কথাটা কি আমার শুনা এতই আবশ্যক" ?

রাণী। "আমি ত মনে করি। কেননা যখন তাহাকে বিবাহ সম্ভব নহে, তখন তাহাকে ভালবাসা দেখাইলে মহারাজ তোমার নামে কলঙ্ক উঠিবে।"

আবার সেই কথা! মহারাজ রাগিয়া গেলেন—বলিলেন—"বৃথা কলঙ্কে ক্ষতি নাই"—

রাণী বলিলেন—"পুরুষের না থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আছে। তুমি রাজা, স্ত্রীলোকের কলঙ্ক মোচন করা তোমার কর্ত্তব্য—তুমি যদি"—

সমস্তই পুরোহিতের মন্ত্রণা, রাণীর মুখে তাঁহার প্রতি কথা!

রাজা বলিলেন—"মহিষি, আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি, অন্য যদি কিছু তোমার বলিবার থাকে বল—উহা আমার ভাবনার বিষয়, আর কাহারো নহে"

রাজার এইরূপ অশান্ত অন্যায় ব্যবহারে রাণীও অপ্রকৃতিস্থ হইলেন, বলিলেন—"তুমি এ বিষয়ে ভাব না বলিয়াই ত আমার ভাবিতে হয়। তুমি যে একজন স্ত্রীলোককে কলঙ্কিত করিতেছ তাহা যদি ভাবিতে তাহা হইলে কি তোমার এইরূপ মতি থাকিত? তোমার মঙ্গল তুমি না দেখিলে আমি অবশ্যই দেখিব, আমার সাধ্যমত আমার কর্ত্তব্য পালন করিব, তোমাকে ও সেই অবোধ বালিকাকে কলঙ্কের পথ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব—"

রাজা। "স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিতে পার,—আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই"

রাণী। "তোমার অনুমতির আগেই আমি তাহা করিয়াছি—সে আমাকে কথা দিয়াছে তোমাকে আর দেখা দিবে না—"

রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, সেই জন্যই তবে সুহারকে দেখিতে পান না! রাণীরই সমস্ত কারখানা! রাজা আগুণ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"মহিষি, স্বামীই স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা—স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব, স্বামীর সুখের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া যে নিজের ঈর্ষা চরিতৃপ্তি করিতে পারে—সে স্ত্রীলোক নহে,আজ হইতে তুমি আমার ত্যজ্যা।"

বজ্রের মত এই কঠোর বাক্য মহিষীর হৃদয়ে গিয়া বাজিল—রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পালঙ্ক হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌরী পূজা।

রাণী সচেতন হইয়া দেখিলেন রাজাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, তাঁহার মুখে আর পূর্ব্বের কঠোরতা নাই, বরঞ্চ যেন একটা উদ্বেগপূর্ণ করুণ ভাব তাঁহার মুখে

ব্যাপ্ত। ইহার উপর আবার যখন রাজা তাঁহার পুরাতন কোমল স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "মহিষি এখন ভাল বোধ হইতেছে ?" তখন অশ্রুজলে রাণীর নয়ন ভাসিয়া গেল। সে অশ্রুজলও যেন রাজার মমতা আকর্ষণ করিল ; রাজার মুখে তাহাতে বেদনার ভাব প্রকাশিত হইল, রাণী আশ্চর্য্য হইলেন। কেবল তাহাই নহে রাণী একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে মহারাজ নিজে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এমন কি, সে-রাত্রে তাঁহার সহিত একত্র শয়ন করিয়া মাঝে মাঝে নীরবে তাঁহাকে একটু একটু আদরও করিলেন, কখনো কখনো বা ভাল আছেন কিনা জিজ্ঞাসাও করিতে লাগিলেন, রাণীর নিরাশ প্রাণেও আশা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে আশা-টুক না জাগিলেই ছিল ভাল। রাণী মূর্চ্ছিত হইলে রাজার মনে সহসা যে বিপদের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল যখন তাহা দূর হইল, তিনি যখন দেখিলেন—রাণী বেশ আরোগ্য হইয়াছেন তখন ক্রমে তাঁহার ভাবেরও পরি-বর্ত্তন হইয়া আসিল। অল্পে অল্পে তাঁহার করুণা-ভাব পূর্ব্বের কঠোরতায় বিলীন হইয়া পড়িল, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজার অন্তঃপুরে আসা শেষ হইল, রাণীর আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল।

রাণী বুঝিলেন, মিথ্যা আশা, মিথ্যা সব। রাজার ভালবাসা আর তিনি পাইবেন না ; তাহারো অধিক,—

রাজার মার্জ্জনাও তিনি আর পাইবেন না, রাজার চক্ষে তিনি দারুণ অপরাধী, সে অপরাধ তিনি ভুলিতে পারেন নাই, বুঝি কখনই পারিবেন না।

রাণী বজ্রাঘাতের যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার ভালবাসা হারাইয়া ইতিপূর্ব্বে যে কষ্ট পাইতেন সে কষ্ট যেন ইহার নিকট স্পষ্ট সুখ। মানুষ ভালবাসার সহস্র অনাদর সহস্র উপেক্ষাও সহিতে পারে যদি সে বুঝে, আমি যাহার জন্য এত সহিতেছি—তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান না পাই—তাহাকে ভালবাসিয়া যে আমার এত কষ্ট অন্ততঃ তাহাও সে বুঝিতেছে। এই বুঝায় সহস্র কষ্টের সান্ত্বনা—এই বুঝাতেই আত্মবিসর্জ্জন সুখময়। কিন্তু রাণী দেখিলেন—রাজা সেটুকও বুঝিতেছেন না, কেবল যে বুঝিতেছেন না তাহা নহে, বিপরীতই বুঝিতেছেন, তিনি ভাবিতেছেন তিনি রাণীর প্রতি অন্যায় করেন নাই, রাণীই তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, রাণীর নিকট তিনি ক্ষমার পাত্র নহেন, রাণীই তাঁহার নিকট দারুণ অপরাধী, রাণী ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সুখে বাদ সাধিয়াছেন—তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। এ অবস্থায় রাণীর সুতীব্র জ্বালার উপশম কোথায়?

রাণীর জীবনে মৃত্যুর ছায়া দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। রাণী মুমূর্ষু ভাব লইয়া শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে বাপ্পা যদি কোলে

আসিয়া বসে, গলা ধরিয়া আদর করে, তিনি তাহার প্রতি-দান না দিয়া একবার শুধু তাহার দিকে চাহিয়া দেখেন তাহার পর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। মায়ের এরূপ অস্বাভাবিক ভাব বাপ্পার ভাল লাগে না; সে তাঁহার কোল ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়। তাহাতে তাঁহার একবার চোখ ছলছল করে না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না।

সখীগণ অনেক সময় তাঁহার সম্মুখে রাজা ও সুহারের কথা লইয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় গল্প করে, রুক্মিণী তাঁহাকে যখন তখন তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভৎর্সনা করে, তাঁহার চোখ ফুটাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া রাজার নামে নানাপ্রকার নূতন গুজবও শুনাইতে ছাড়ে না, কিন্তু রাণী সকলি চুপ করিয়া শুনিয়া যান, কিছুতেই কিছু কথা কহেন না; সখীরা তাঁহার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

সখীরা আজকাল তাঁহার কাছে নিয়মিত নৃত্যগীত করে, দিন কতক আগে তাহাতে তিনি যেরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন—এখন সে সব কিছুই নাই, তাহারা তাঁহার নিকট আমোদের কথা কহিলেও তিনি তাহাদের থামিতে বলেন না। তাহারা ভাবে দিন দিন রাণী তাঁহার দুঃখে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন, তাহারা আহ্লাদিত হয়, রুক্মা কেবল তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া কাঁদিয়া মরে। তাহাদের এই আমোদ ও কান্নায় রাণীর মনে

কোন ভাবেরই ব্যত্যয় হয় না। কোন সুখ দুঃখ যেন আর তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার নির্জীবতাকে জীবন দিতে পারে না, মৃত্যুর আলিঙ্গনেই বুঝি একমাত্র তাঁহার নবজীবন পাইবার আশা আছে।

কিন্তু এ কথা আমরা বলিতেছি; তাঁহার হৃদয়ে এরূপ কোন আশা নিরাশার কথাও যেন উদয় হয় না, তাঁহার এ জীবনের একটা পরিণাম যে শীঘ্র আসিতেছে তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, কিন্তু সে পরিণামে আশা কি নিরাশা, আঁধার কি আলোক, তাহা তিনি ভাবেন না, এ কথা মনে হইলে তাঁহার কেবল এই মনে হয়, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার একটি কাজ করিবার আছে।

আজ গৌরীপূজার শেষদিন। রাজবাড়ীতে অনজ মহোৎসব! গৌরী আজ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরের রমণীগণ কর্ত্তৃক প্রাসাদ হইতে অবতরিত হইয়া মন্দির ঘাটে আনীত হইবেন। ইহা মহিলাদিগেরই বিশেষ পর্ব্ব। রাজবাটীর মহিলাগণ আজ সমস্ত নিরানন্দ ভুলিয়াছে। তাহারা গৌরীকে ঘাটে লইয়া গিয়া পূজা, আমোদ, উৎসব করিবে।

পুরুষ যদিও মুখ্যভাবে কেহ এ উৎসবের মধ্যে নাই তথাপি এ উৎসবে তাহাদেরও যে আনন্দ কিছুমাত্র কম তাহা নহে। তীরে উৎসব-আসরে পুরুষের গতি-

বিধি নিষিদ্ধ, সুতরাং অসংখ্য নৌকা নদীবক্ষ আন্দোলিত করিয়া শত শত উৎসুকদৃষ্টি, কৌতূহল-উত্তেজিত দর্শক পুরুষদিগকে ধারণ করিয়া আছে। রাজার নৌকা, সমস্ত নৌকা সমূহের অগ্রে।

সেতারা বীণ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ঝঙ্কার ও রমণী কণ্ঠের গীতধ্বনি ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উথলিয়া উঠিতে লাগিল, দর্শকগণ প্রত্যেকের মস্তকের উপর প্রত্যেকে ঊর্দ্ধমস্তক হইবার চেষ্টায় নৌকা জলমগ্ন করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজোদ্যান নানাবর্ণের ফুলে যেন সজ্জিত হইয়া উঠিল। নানা বর্ণ-বস্ত্রে নানারূপ সাজে সজ্জিত নদী-অভিমুখী রমণী মণ্ডলীর সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ যেন সহসা নদীবক্ষ পর্য্যন্ত অভিঘাত করিয়া তুলিল, দর্শক বৃন্দ সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, দাঁড়ির হাতের দাঁড় আর নামিল না, মাঝি হাল চালাইতে ভুলিয়া গেল, অপরিমিত ঔৎসুক্য-পূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে সকলে তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই জানিতে ব্যস্ত কে আজ গৌরীর অগ্রগামী হইয়া আসিতেছেন? কোন সৌভাগ্যবতী মৃগনয়নী, কোন "নাগিনী অলক" রমণী রাণীর শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া রূপসী-শ্রেষ্ঠ রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া আজ এই সম্মানের পদ লাভ করিয়াছেন? কত স্বামীর, কত পিতার, কত ভ্রাতার, কত আত্মীয়ের হৃদয়-স্পন্দন সহসা যেন বন্ধ হইয়া পড়িল।

সাধারণ কৌতূহলের মধ্যে রাজা এতক্ষণ কেবল নিরুৎ-সুক ভাবে বসিয়াছিলেন, উৎসবের কথা এতক্ষণ তাঁহার যেন মনেই ছিল না, উথলিত গীতধ্বনি এতক্ষণ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ, কেন না তীরের দিকে তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত একবার চাহিয়াও দেখেন নাই, নদীর গর্ভে যে দিকে দু একটি বড় বড় প্রস্তর খণ্ডকে আহত প্রতিহত করিয়া সুহারমতীর কৃষ্ণ জলরাশি সফেন শ্বেত তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতেছিল, রাজা সেই দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই জল রাশির দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি কাল রাত্রে কি যেন একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার হৃদয় এইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বপ্নটি কি তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিন্তু মনে পড়িতেছিল না; অনেক করিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতে মনে পড়িল না। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ঊর্দ্ধ মুখ হইলেন; মুখ উঠাইবার সময় তাঁহার তীরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন রমণীমণ্ডলী নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই সৌন্দর্য্য-দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়াই হৌক, কিম্বা অভ্যাস বশতঃই হৌক সহসা তাঁহার স্তিমিত দৃষ্টিতেও ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইল।

রমণীগণ নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মন্দিরদালান রূপের আলোকে ভরিয়া গেল, নদীর সোপানে গৌরী

অবতরিত হইলেন, সহস্র সহস্র কৌতূহল-উদ্দীপ্ত নয়ন দেবীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে একটি মানবী-মূর্ত্তির উপর স্থাপিত হইল। সকলে দেখিল গৌরীর অগ্রগামী চামর-ধারী জীবন্ত লক্ষ্মী-স্বরূপা প্রতিমা কে? সুন্দরীর হস্তস্থিত চামর আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া তাহার মস্তকের ওড়না স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, জুঁই ফুলে সজ্জিত যত্ন বিন্যস্ত কেশভার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই শিথিল সাজসজ্জা তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যকে দর্শকদিগের চক্ষে যেন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। রাজা কি দেখিতেছেন কাহাকে দেখিতেছেন তিনি বুঝিতে পারিলেন না, দর্শকবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গৌরী প্রণাম করিল, তিনিও প্রণাম করি-লেন, কিন্তু বুঝিলেন না কাহাকে প্রণাম করিতেছেন—কে দেবী। তিনি যখন প্রণাম করিয়া আবার মুখ তুলি-লেন—তখন সুহারের কেশরাশি একেবারে এলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সেই কৃষ্ণ কেশপাশের মধ্যে মহা-রাজের দৃষ্টি যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল, মহারাজের মনে পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্নটি সহসা জাগিয়া উঠিল—তিনি আবার সেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সুহারের কেশরাশির অন্ধকার যেন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মহারাজ আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, এক দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি মগ্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেই অন্ধকারকে সবলে ছিন্ন

করিয়া একটি আলোক ধরিতে ব্যগ্র হইয়া সেই অন্ধকার-কেই সবলে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। অমনি সেই অন্ধকারের মধ্যে দুইটি মুখ তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল, একজনের মুখে হাসি, এক জনের বিষাদময়ী প্রতিমা। প্রথমটি গণগৌরী মহাদেবী, মহারাজের দুর্দ্দশায় তিনি হাসিতেছেন, কিন্তু বিষাদময়ী প্রতিমাখানি কার তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না, যেন তাঁহাকে চেনেন, খুবই চেনেন, যেন হঠাৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। রমণীর নেত্র হইতে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, রাজা চমকিয়া উঠিলেন—দেখিলেন তাহা অশ্রুবিন্দু নহে রক্তবিন্দু; তখন তিনি সেমন্তীকে চিনিতে পারিলেন। সহসা সেই রক্ত বিন্দু একটি রমণী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, রাজা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন তিনি ত অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়া নাই—সেই রমণীকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। সে রমণী আর কেহ নহে, সুহার, তখন তিনি আবার আর সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার মনে হইল, জগতে আর কেহ নাই, বিশ্ব কেবল তিনি ও সুহার-ময়। এই সময় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, স্বপ্নের শেষ অনুভাব মাত্র হৃদয়ে লইয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রমণীগণের নৃত্য গীত উৎসব শেষ হইয়াছে, তাঁহারা গৌরীকে ফিরাইয়া লইয়া গৃহে গমন করিতেছেন। মহারাজ সেই রমণীদিগের মধ্যে একজনকে আর একবার

দেখিবার প্রত্যাশায় উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন, ততক্ষণ নৌকা বাচ খেলিয়া তাঁহাকে দূরে লইয়া ফেলিল, তিনি তথাপি সতৃষ্ণ নয়নে উন্মুখ হইয়া রহিলেন। বুঝি বুঝিতেও পারিলেন না, সে ঘাট আর তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে নাই।

আর সকলকে গৌরীর সহিত গৃহে পাঠাইয়া সেমন্তী মন্দিরঘাটে অশ্রুহীন-নেত্রে তখনো দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন রাজার নৌকা চলিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—"নাথ, এখনো কি তুমি মনে করিতেছ আমি ঈর্ষাবশতঃ সুগারকে তোমার দৃষ্টি পথ হইতে সরাইয়াছিলাম, এখনো কি তুমি মনে করিতেছ ইচ্ছা করিয়া আমি তোমার সুখে বাদ সাধিয়াছি?"

এক-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

যাহা সত্য যাহা সুন্দর তাহাই মহিমাময়,—সর্ব্বত্র তাহার মাহাত্ম্য—তাহার সমাদর ইহা সত্য, কিন্তু এ সত্য অনন্তের পক্ষে যেমন অকাট্য সত্য—সংসারের পক্ষে তেমন নহে। কত সত্য সংসার ধারণা করিতে পারে না—কত সৌন্দর্য্য অনাদরে ম্লান হইয়া যায়! বেদের সত্য পুরাণে

বিকৃত, বিজ্ঞানের সত্য অজ্ঞানে আবরিত। কত গুণ অমর্য্যাদায় অনন্তের জ্যোতিতে আত্ম মিলাইতেছে—কত রূপ বিষাদের কারার মধ্যে ফুটিয়া অনাদরে ঝরিয়া পড়িতেছে। অনন্ত তাহাদের আদর করিয়া লইতেছে সত্য, তাহাদের মঙ্গল ভাব অনন্তের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে সত্য, কিন্তু সংসার কি তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে? এই শত সহস্র মহিমাদিগের মধ্যে সহসা যে দুয়েকটি সংসারের অনুগ্রহ নয়নে পড়ে—তাহারাই ক্ষণজন্মা,—ক্ষণের গুণেই তাহাদের আদর, তাহাদের মহিমা-গুণে নহে। কেননা তাহাদের মত কিম্বা তাহাদের অপেক্ষা আরো ত এমন অনেক মহিমা সংসারে জন্ম লইয়াছে, কিন্তু তাহারা ত কই এই শুভাদৃষ্টদিগের ন্যায় আদর পায় নাই! কত শত সুকোমল সুগন্ধ ফুল রাশি কঠোর পদাঘাতে প্রতিদিন দলিত হইতেছে—কিন্তু ঐ যে দেখিতেছ গন্ধহীন শুষ্ক স্খলিতদল মালাগাছি অতি যত্নে এখনো রক্ষিত হইয়াছে—উহা কেবল এক শুভক্ষণের প্রণয়োপহার বলিয়া বইত নয়!

সুহারও বোধ হইতেছে সেইরূপ একজন ক্ষণজন্মা। মহারাণীর নিকট সৌন্দর্য্য-সম্মান পাইয়া তাহার রূপের প্রশংসায় সহর ধ্বনিত হইতেছে। রাজধানীতে কি আর তাহার মত কেহ সুন্দরী নাই? কেন মহারাণী নিজে কি কিছু কম রূপসী? কিন্তু ভীলকন্যার সৌন্দর্য্যের কথা ছাড়া

আর কাহারো মুখে কোন কথা নাই। যাঁহারা আপনা-দিগকেই এতদিন প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া জানিতেন—তাঁহারা কেবল এই প্রশংসায় ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছেন ও মাঝে মাঝে নাসিকা তুলিয়া সুহারের কোথায় কোন খুঁৎটি আছে বাহির করিতে গিয়া আপনাদের ইচ্ছার বিপরীতেও তাহার রূপেরই ব্যাখ্যান করিতেছেন।

মহারাণী স্বয়ং কাল ইচ্ছা করিয়া সুহারকে ডাকিয়া লইয়া এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন—জুমিয়ার হৃদয় একেই আহ্লাদে ভরিয়া গিয়াছে—তাহার উপর আজ আবার সকলেরি কাছে কন্যার এই সমাদরের কথা শুনি-তেছে—জুমিয়া সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী ফিরিয়া গেল তখন তাহার যেন আর মাটীতে পা পড়ে না। বাহির হইতে আসিয়া প্রতিদিন সে যেমন সর্ব্বাগ্রে জঙ্গুকে দেখিতে যাইত, আজও আনন্দভরা হৃদয় লইয়া প্রথমেই তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল—জঙ্গুর মুখ অতি-শয় গম্ভীর, অতিশয় অন্ধকার,—বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি জুমিয়া জঙ্গুর এরূপ ভ্রূকুটিবদ্ধ অন্ধকার মুখ দেখে নাই। যে দিন জঙ্গু জুমিয়াকে নাগাদিতোর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন সেই দিন জুমিয়া তাঁহার এইরূপ মুখ দেখিয়াছিল। জুমিয়া চমকিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবাডা ভাল আছুন?"

জঙ্গু বলিলেন—"জুমিয়া,কি শুনুছি কি—পাষণ্ড রাজাডা মুইদের ধরম খোয়াউতে চায়!"

জুমিয়া কিছুই বুঝিল না—অবাক হইয়া রহিল।

জঙ্গু সমধিক উগ্রস্বরে বলিলেন "শুনুছিস, সোই পাষণ্ড অমনিষ্যি নাগাদিত্যড়া—যানারে তুইডা পরাণ বঁধু ভাবুচিস সেইডা তোর মেয়েরে ভুলই লউছে।

জুমিয়ার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, জুমিয়া বলিল—"বাবা, কি বলুস?"

জঙ্গু বলিলেন—

"সেইডা—তোর পরাণ বঁধুডা—তোর দেউতাডা রাতে চুপুচুপি সুহারের সাথে রোজ দেখা করুছে—তানাডার যাদুতে সুহার ধরম ভুলুল—জেবান খোয়াউল, সেই পাষণ্ডরে সুহার ভালুবাসুছে। তানার লাগিন সে সব করুতে পারে—তানারই লাগি সে ক্ষেতিয়ারে বিয়া করুতে নারাজ। যানার লাগিন তুইডা ধরম খোয়াউলি—তোর সেই বঁধুর লাগিন তোর মেয়েডাও ধরম ভুলুছে।"

বলা বাহুল্য জঙ্গকে ক্ষেতিয়া সব কথা বলিয়াছে। সে যখন দেখিল গৌরীর অগ্রগামী হইয়া আবার সুহার রাজার সহিত দেখা করিল তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না, সেই গণৎকারের পরামর্শ আর সে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না—পর দিনই সে জঙ্গুকে সব খুলিয়া বলিল।

গায়িকা-প্রতিমা তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাঁহার মনের মধ্যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে, আকাশ পাতালে তাহা বিরাজ করিতেছিল, রাজার হৃদয় সেই অসংখ্য অনন্ত এ কই মূর্ত্তির মধ্যে তিল তিল করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজার তাহা ফিরাইবার ক্ষমতা নাই, বিশ্বের মত তাঁহার হৃদয় কেবলি শত তরঙ্গে উচ্ছাসিত হইয়া সেই অনন্ত মূর্ত্তির উপর যেন লীন হইতেছিল। রাজা নদী হইতে উঠিলেন— কিন্তু বাড়ী গেলেন না। সভাসদেরা সকলে অভিবাদন করিয়া গৃহে ফিরিল, তিনি সেই উন্মত্ত ঘূর্ণ্যমান মদির-বিহ্বল আলোড়িত মস্তক লইয়া নদী তীরে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিছু পরে প্রহরীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"গণপতি ঠাকুরকে এইখানে ডাকিয়া আন"।

গণপতি এখন আর মন্দিরে থাকেন না, যতদিন নূতন মন্দির শেষ না হয় ততদিন রাজপ্রাসাদেরই একটি কক্ষে গণপতির আবাস। গণপতি আসিয়া দেখিলেন, মহা-রাজের মুখ চক্ষু প্রদীপ্ত অথচ অন্ধকার, ওষ্ঠের উপর শুষ্ক অধর সজোরে রক্ষিত, কি যেন আবেগ ভরে বাম হস্ত নবীন শ্মশ্রু জালে ঘন ঘন অর্পিত হইতেছে, দক্ষিণ হস্ত কটীস্থ তরবারিতে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আছে। গণপতিকে দেখিয়া মহারাজ সহসা যেন বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মন্দির সোপানে উপ-বিষ্ট হইতে কহিয়া নিজেও সেই সোপানে উপবিষ্ট হই-

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নববিধান।

রাজবাটীর মহিলাগণ গৃহে ফিরিয়া গেলে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় রাজা ও সভাসদদিকের নৌকায় খানিকক্ষণ ধরিয়া বাচ চলিল। কিন্তু এবারকার বাচ বড় জমিল না, কেননা ইহাতে রাজার উৎসাহ প্রকাশ পাইল না,—সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই দাঁড়ি মাঝিগণ বাচ বন্ধ করিয়া অন্য অন্য ঘাটের ছোট ছোট সমারোহের নিকট দিয়া নৌকা আস্তে আস্তে কূলে কূলে চালাইয়া লইয়া চলিল। ঘাটে ঘাটে সুন্দরীগণ গান গাহিতে গাহিতে রাজার নৌকা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নত হইতে লাগিল, তাহাদের উৎসাহিত হৃদয়ের গীতি-উৎস রাজ দর্শনে দ্বিগুণ ভাবে উথলিত হইতে লাগিল। রাজার নৌকা সেই সকল দৃশ্যের পার্শ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে সকল কিছুই আর রাজার নয়নে পড়িল না।

নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোট আবার মন্দির ঘাটে লাগিল, রাজা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তীরের দিকে চাহিলেন; তাহার পর কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন। তখনো তাঁহার মনে পূর্ণমাত্রায় তীরের সেই রূপের দৃশ্য জাগিতেছিল, সেই পুষ্পসজ্জিত-স্খলিত কেশা, সচকিত নয়না, মূর্ত্তিমতী শ্রীরূপিণী লজ্জাশীলা

জুমিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখে আশার ভাব উদ্দীপ্ত হইল।

জঙ্গুর হৃদয় আশা পরিতৃপ্তির আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু জুমিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল "বাবা, বিয়া, বিয়া, রাজার সনে সুহারের বিয়া, নউলে রক্তের তুফন তুলুলেও এ কালী ধুউবার নয়—"

জঙ্গু তাহার কথায় অবাক হইলেন, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন—জুমিয়া কি বলিল! তীব্র বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "রাজা তুইডার মেয়েরে বিয়া করুবে?"

জুমিয়া। "বাবা, মোর মেয়ে নাই—তুইডা জানুস সুহার মোর মেয়ে না—ক্ষতিয়া-কনিয়া (ক্ষত্রিয় কন্যা)। মুই রাজাডারে তাই বলুব"—

একটু আগে জঙ্গুর দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল এবার জুমিয়া শোধ লইবে, নিরাশ হইয়া বলিলেন, 'কাপুরুষ, যদি বিয়া করে ত তোর মেয়ে বলি করুবে না—তানারে মেয়ে দিবি? রক্ত রক্ত—এ অপমানডার শোধ রক্ত"—

জুমিয়া বলিল—"যদি বিয়া না করে মুইডা এই কিরে (শপথ) করুছি তানাডার রক্তে এই অপমানডার শোধ লউব, জানুব সে সত্যই পাষণ্ড, মোর বঁধু নয় শত্রুর।

বলিয়াই জুমিয়া জঙ্গুকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জঙ্গুর কথা শুনিয়া জুমিয়া পাগলের মত স্বরে বলিল--"মিছা মিছা! এ হউতে নারে?"

জঙ্গু গৃহের অন্য দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"ক্ষেতিয়া কথাডার উত্তর দে। শুনুছিস তুই মিছা বলুস।"

ক্ষেতিয়া সেই ঘরেই কিছু দূরে বসিয়াছিল জুমিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, সে ক্রুদ্ধভাবে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "মিছা না, সব সত্যি। মুই এই দুই চক্ষে দেখিনু—রাতে সুহার রাজাডার সাথে বেড়াউছে। ইচ্ছা করুস সুহারকে শুধুই দেখ; সেডাও এ কথা মিছা বলুবে না।"

জুমিয়ার রক্ত চন চন করিয়া উঠিল, সে দাঁড়াইয়া তাহার বজ্রমুষ্টি ক্ষেতিয়ার দিকে নিক্ষেপ করিল, এ কথা যে মুখে আনে সেই যেন শাস্তির যোগ্য। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, তাহার মুখের কঠোরতা অসহ্য কষ্টকর ভাবের বিকাশে প্রশমিত হইয়া পড়িল—জুমিয়া বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। জঙ্গু বলিলেন—"রক্ত, রক্ত, জুমিয়া, কাঁদ্‌বার কাল এডা নয়।"

জুমিয়া বলিল, "রক্ত! রক্তে কি এ কালী ধুইতে পারুবে!

জঙ্গু সেই বজ্র স্বরে বলিলেন, "হুঁ রক্ত, রক্ত সেই পাষণ্ডের রক্ত দিউ এ কালী ধুই ফেল"

লেন। খানিকক্ষণ তাঁহাদের মৌণভাবেই কাটিল। রাজা কি বলিবেন যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কিছু পরে বলিলেন "ঠাকুর আপনার সহিত আমি একটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাই"

রাজার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া গণপতি ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কম্পমান স্বরে—তাঁহার অসময়ের এই কথায় আরো ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "পরামর্শ! এখনি বলিতে আজ্ঞা হউক"

রাজা বলিলেন—একটু থামিয়া বলিলেন—"কথাটা এই, আমি জানিতে চাই, রাজার কাজ কি? আপনি কি বলেন?"

গণপতি অবাক হইলেন, কি ভাবিয়া রাজা ইহা বলিতেছেন বুঝিলেন না; বলিলেন "রাজার কাজ? প্রতিপালন।"

রাজা। "প্রতিপালনের অর্থ কি? প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দ রক্ষা করা?"

গণপতি। "হ্যাঁ রক্ষা করা।"

রাজা। "তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দ রক্ষার জন্যই দণ্ডবিধির আবশ্যক?"

গণপতি। "হাঁ যথার্থ—"

রাজা। 'কেবল দণ্ডবিধি নহে—সমাজ বিধিরও আবশ্যক?"

গণপতি। "অবশ্য অবশ্য—"

রাজা। "যখন দেখা যায়—কোন প্রতিষ্ঠিত বিধি সাধারণ সুখ স্বচ্ছন্দের পক্ষে হানিকর তখন সে বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য বিধি প্রবর্ত্তিত করা রাজার অবশ্যই কর্ত্তব্য ?"

গণপতি। "অবশ্য অবশ্য।"

রাজা তখন ধীরে ধীরে বলিলেন—

"ঠাকুর, আমি বিবাহ সম্বন্ধে একটি নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে চাই—"

গণপতি চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন "বিবাহ সম্বন্ধে ?"

রাজা বলিলেন—"হাঁ বিবাহ সম্বন্ধে। বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক বিধি বড়ই মন্দ—"

গণপতি। "কিন্তু বিবাহ কি সামাজিক বিধি ? ইহা স্বয়ং ভগবান মনু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অন্যে কি—"

রাজা বলিলেন—"মনু যে বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তাহা আর এখন ধর্ম্ম বিবাহ বলিয়া চলিত নাই, আমি সেই বিধিই পুনঃ প্রচলন করিতে চাই"—

গণ। "তাহাই পুনঃ প্রচলন করিতে চান ?"

রাজা। "হাঁ। মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন—"

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ সা চ বিশঃ স্মৃতে
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চস্বা চাগ্রজন্মণঃ।

কিন্তু এখন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি নিজ বর্ণের কন্যা ব্যতীত অন্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন তবে তাহা ধর্ম্ম বিবাহ বলিয়া সিদ্ধ হইবে না,—কি ভয়ানক—”

গণপতি। “কলিযুগ—মহারাজ কলিযুগ—!”

রাজা। “কিন্তু কলিযুগে মানুষও জন্মিতেছে তাহাদের সুখ দুঃখও উপেক্ষনীয় নহে”—

গণপতি! “তাহা সত্য।”

রাজা। “তাহা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আপনার আজ্ঞায় আমি মনুর বিধান পুনঃ প্রচলন করি”—

গণ। “কিন্তু—”

গণপতির সহসা বোধ জন্মিল, এতক্ষণ পরে রাজার হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিলেন, গণপতি কি কথা বলিতে গিয়া সহসা থামিয়া বলিয়া ফেলিলেন—“মহারাজ ভীলকন্যাকে আপনি বিবাহ করিতে চান ?—”

রাজা চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গণপতি বলিলেন—“কিন্তু তাহাতে ত নূতন বিধির আবশ্যক কিছু দেখি না,—কোন্ গর্ব্বিত ভীলপিতাও না তাহার কন্যাকে আপনার দাসী করিতে সৌভাগ্য জ্ঞান করিবে ? আপনার ইচ্ছা প্রকাশের মাত্র অপেক্ষা।”।

রাজা কি বলিতে যাইতেছিলেন—আর বলা হইল না, দেখিলেন যেন তাঁহাদের দিকে কে অগ্রসর হইতেছে,

অল্পক্ষণের মধ্যেই জুমিয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন স্থির।

জুমিয়ার দিকে মহারাজ বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিলেন, জুমিয়ার দৃঢ় মুষ্টিতে বর্ষা, মুখ দন্থাপীড়িত ভীষণ, জুমিয়া বিনা অভিবাদনে সোজা হইয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া, কম্পবান তীব্রকণ্ঠে বলিল,—'মহারাজ তোর কাছে মুইডা কোন দোষ করু নি, মুই শুধু তুইডারে ভালবাসুছি, পরাণের বধু ভাবুছি, এই লাগিন চের সহুছি, মহারাজ এই দোষে কি তুই মোর বুকে ছুরির অধিক মারুলি? মোদের কুলে কালী দিউলি?"

ভীল আর পারিল না—রাজার পদতলে বসিয়া পড়িল, আবার বালকের মত দুই চক্ষু তাহার জলে ভাসিতে লাগিল।

মহারাজ বলিলেন—"মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!"

জুমিয়া চোখ মুছিয়া, শান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল "মিছা তা মুই জানি। মুই তোরে বিশ্ব (বিশ্বাস) করি কিন্তু মুইডার আপন জন কোনডাই ত আর তোর এ কথাডা বিশ্ব করুবে না।"

রাজা উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন "বিশ্বাস করিবে না, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না?"

জুমিয়া। "না তা করুবে না, মহারাজ তোর কাজে মুইদের নামে যে কলঙ্ক রটুছে তোর কাজেই সে কলঙ্ক ঘুচ্‌বে, তোর কথাডায় না।"

গণপতি বলিলেন—"জুমিয়া তোর কন্যাকে"—

জুমিয়া তাহাকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল—"মহারাজ এ কালা মুছুবার উপর একডা ছাড়া আর দুইডা নাই।

মহা। "কি?"

জুমিয়া। "সুহারেরে তোর বিয়া করুতে হউবে।"

রাজা এতক্ষণ বিবাহের জন্য লালায়িত ছিলেন, কিন্তু যখনি জুমিয়া দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে বলিল—তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে—তখনি রাজা বলিলেন—"অসম্ভব—তোমরা ভীল আমরা ক্ষত্রিয়।"

ভীল বলিল—"না রাজাডা। মুইরা ভীল, কিন্তু সুহার ভীল না, সে ক্ষতিয়-কনিয়া।"

"সে ক্ষত্রিয়কন্যা"! গণপতি ও রাজার মুখ হইতে এক সঙ্গে এই বিস্ময়-সূচক কথা উত্থিত হইল।

জুমিয়া বলিল "হুঁ সে ক্ষতিয়-কনিয়া। সুহারমতীর তীরে তানারে মুই পাউছিনু। মুই এখনো শুনুছি তানাডার মা বলুছে 'ক্ষতিয়ানীর শিশুকে লও'।"

সুহারের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত ভীল সবিশেষ বলিয়া গেল।

ভীলের কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই, সুহার যে ক্ষত্রিয়কন্যা তাহার মূর্ত্তিতেই তাহার প্রমাণ। রাজার মুখে আনন্দ বিভাসিত হইল।

ভীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এহন বল বিয়া করুবি কি না? এহন এ বিয়া ভাঙ্গুতে যদি চাউস—ত মুইডার শোধ এই—" জুমিয়া বর্ষা উত্তোলন করিল।

আবার জোরের কথা, ভয় প্রদর্শন! রাজার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, কিন্তু রাজার জীবনে এই প্রথমবার অন্য ভাবের উচ্ছাসে সে ভাব ক্ষীন হইয়া পড়িল, রাজা বলিলেন—"জুমিয়া, আমি বিবাহ করিব, কিন্তু তোমার ভয়েও নহে, তোমার অস্ত্রের ভয়েও নহে। যদি অস্ত্র দেখাইয়া আমাকে বিবাহ করাইতে চাও, ত বিবাহ হইবার কোন আশা দেখিতেছি না, সুতরাং ও কথা না বলিলেই ভাল।"

ভীল বর্ষা কটিতে রাখিয়া বলিল—"যদি বিয়াই করুবি ত এহনি কর—আজি রাতে।"

গণপতি বলিলেন "আজই বিবাহ! জুমিয়া তুই পাগল হইয়াছিস?"

জুমিয়া বলিল—"হুঁ মুই পাগল হউছি, যতথণ রাজা মুইদের নাম না রাখুছে—(আমার কন্যার কলঙ্ক না দূর করিতেছেন) ততথণ মুইডার মনে শোয়াস্তি নাই, কোনডারেও বিশ্ব নাই। মুইডা যথন বাড়ী যাউব, রাজারে

মেয়ে দিউতে যাউব, নউলে মোর দাঁড়াইবার জমীন টুকুও নাই।”

রাজা বলিলেন—“গণপতি, আমি আজই বিবাহ করিব, রাত্রে আজ লগ্ন কথন?”

গণপতি মুখে মুখে গণনা করিয়াই বলিলেন, “চতুর্থ প্রহরে লগ্ন আছে, সেই সময় বিবাহ হইতে পারে।”

জমিয়া। “মহারাজ মোর আর একডা ভিক্ষা। চুপ্-চুপি বিয়া হউবে না, রাজার মত জাঁকজমকে বিয়া হউক, রাজসভার সকুলে এ বিয়াতে বরযাত্র আসুক, মুই সবুযের সাক্ষাতে মোর নিজের ভিটার উপর দাঁড়ায়ে মোর মেয়েরে দান করুব—এইডা ভিক্ষা।”

রাজা বলিলেন—তাহাই হউক। ঠাকুর, সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিন।”

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-সভা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার বিবাহ বার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইল। গৌরী পূজার উৎসব না থামিতে থামিতে বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল। সকলেই শুনিল সুহার ক্ষত্রিয়ানী। সৈন্য সামন্তেরা সজ্জিত হইতে হইতে ভীল-

কন্যার ও মহারাজের জয়ধ্বনি তুলিল। অন্তঃপুরে রাণীও শুনিলেন, মহারাজের আজ বিবাহ। তিনি বলিলেন, "মহারাজ নিজে এখবরটা দিতে আসিলেন না—এই দুঃখ, না দিন আমি নিজে কন্যা সাজাইয়া বিবাহ সভায় তাঁহার উপহার লইয়া যাইব।" রাণী আপনার অলঙ্কার বসন ভূষণ লইয়া জুমিয়া ভবনে গোপনে গমন করিলেন। রুক্মা রাণীর ব্যবহারে অবাক হইয়া ঘরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল এবং সুহারের প্রতি অবিরত অযথা বাক্য বর্ষণ করিতেও ছাড়িল না।

তৃতীয় প্রহরে রাজা সসৈন্য সসামন্ত জুমিয়ার বাটীর মাঠে আগমন করিলেন।

যেমন সহসা বিবাহ, বিবাহের বন্দবস্তও তদনুযায়ীক। জুমিয়ার ক্ষুদ্র বাটীতে এত বরযাত্রের স্থান নাই, বাটীর সম্মুখের মাঠেই বিবাহের সম্প্রদান-সভা। এ সভায় সকলেই অশ্ব পৃষ্ঠে আসীন, কন্যা আগমন করিলে সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই কন্যা সম্প্রদানিত হইবে। সকলেই উৎসুক কখন কন্যা আনীত হইবে, কিন্তু তথাপি জয়ধ্বনি, হাস্য পরিহাসে, আমোদ উল্লাসে সকলের সময়ই দ্রুত চলিয়া যাইতে লাগিল, কেবল রাজা প্রতি মুহূর্ত্ত যুগের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন, বিবাহের এই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ই কেবল অজ্ঞাত বিষাদে পরিণত হইল, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আগত

মিলন সম্মুখে অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না, যেন সেই মিলনের মধ্যে একটা অনন্ত ব্যবধান পড়িয়া আছে, একটা বিভীষিকা আলেয়ার মত তাঁহার নিকট জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। যখন চতুর্থ প্রহর শেষ হইল, সৈন্যসামন্তদিগের হস্তের দীপমালা মলিন করিয়া মুক্ত মাঠে উষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে চাহিল, পুরোহিত যখন সুহাবের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা পূর্ব্বক তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তাহাকে পুনঃপ্রদান করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন রাজার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। এক সঙ্গে শত শত দীপ মালার রশ্মি সেই সালঙ্কৃতা সসজ্জা যুবতীর মুখে বিভাসিত হইল, তাহার দিকে চাহিয়া তাহার পশ্চাতের দীন হীনবেশা বিষাদিনীর প্রতি আর মহারাজের দৃষ্টি পড়িল না। ঠিক এই গাছতলায় বহুদিন আগে উষালোকে তিনি একটি বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, উষার ন্যায় কল্যাণময়ী সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তি রাজার মনে পড়িল, সেই মূর্ত্তিই কি এখন এই প্রখর জ্যোতির্ম্ময়ী যুবতী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে ?

পুরোহিত বলিলেন—“মহারাজ অবতরণ করুন।” শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনির মধ্যে মহারাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বৃক্ষতলে আগমন করিলেন, জুমিয়া কন্যার হস্ত ধরিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিবে বলিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু জুমিয়া আগুয়ান না হইতেই রাণী সুহারের হাত ধরিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইয়া

দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"মহারাজ আমি ঈর্ষা বশতঃ তোমার সুখের পথে বাধা দিই নাই। নিজ হস্তে আপনার সুখ তোমাকে দান করিতে আসিয়াছি গ্রহণ কর।"

রাণীর শেষ কথা আর শোনা গেল না, সহসা একটা দারুণ কোলাহল উঠিল, রাণী চমকিয়া চাহিলেন, রাজা, পুরোহিত, জুমিয়া সকলেই চমকিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সৈন্য সামন্ত ঠেলিয়া হরিদাচার্য্য উন্মত্তের মত দ্রুতবেগে এইদিকে আসিতেছেন, আর বলিতেছেন "সাবধান! সুহার ক্ষত্রিয়ানী নহে, ব্রাহ্মণ কন্যা। বিবাহ বন্ধ হউক, বিবাহ বন্ধ হউক।"

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অব্যর্থ-গণনা।

বিবাহের বাজনা থামিয়া গেল, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি নীরব হইল, জনগণের আনন্দকল্লোল থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। মহিষী এক হস্তে সুহারের, অন্য হস্তে রাজার হাত ধরিয়া উভয় হস্ত এক করিয়া দিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার হাতেই উভয়ের হাত রহিয়া গেল, আর এক করা হইল না। ক্রমে তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে রাজার হাত ধীরে ধীরে নামিয়া

পড়িল—সুহার কেবল মহিষীর শিথিলহস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল। গণপতি নীরবে হরিদাচার্য্যের প্রতি অপ-রাধীর দৃষ্টিতে চাহিলেন, রাজারও মুখে কথা ফুটিল না। নীরব-তাঁহার ক্রুদ্ধ বজ্রঃকটাক্ষ হরিদাচার্য্যের প্রতি নিপ-তিত হইল। জুমিয়া কেবল সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্রদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কোন্‌টা বলুল—সুহার বামণী? সুহার ক্ষতিয়াণী—বিয়া বন্ধ হউবে না—বিয়া হউক—"

হরিদাচার্য্য বলিলেন—"সুহার ব্রাহ্মণকন্যা না হয়—আমি নিজে পুরোহিত হইয়া এ বিবাহ-কার্য্য সমাধা করিব—কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে তুমি আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, আমি যাহা জানিয়াছি—সত্য কি না বল। তুমি সুহাবকে কোথায় পাইয়াছ?

জুমিয়া। নদী পাড়ে।

হরিদাচার্য্য। কয় বৎসর পূর্ব্বে?

জুমিয়া। ১৪ বছর হউবে।

হরিদাচার্য্য। গণপতি, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বেই কি আমি তীর্থযাত্রায় বাহির হই নাই?

গণপতি। আজ্ঞে হাঁ।

হরিদাচার্য্য। আমি যাইবার পরই কি আমার ভ্রাতা স্ত্রী-কন্যার সহিত শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় জলমগ্ন হন নাই?

গণপতি। হাঁ তখনি।

হরিদাচার্য্য বলিলেন—"আমার ভ্রাতুষ্কন্যা গৌরী তখন ২ বৎসরের, জুমিয়া যখন বালিকাকে পাও—তখন তাহার বয়স কত হইবে ?"

জুমিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—

"বয়সডা অমনিই আছুল—তাই বলু সুহার বাম্মণী ? মুইডা বলুছি ঠাকুর, সুহার ক্ষতিয়াণী। সুহারের মা মুইডারে ওরে সঁপিবার কালীন বলুছিল যে সুহার 'ক্ষতিয়াণী'।"

বলিয়া জুমিয়া তাহার প্রাপ্তি ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

হরিদাচার্য্য শুনিয়া বলিলেন—"আর কোন সংশয় নাই, সুহার আমারি ভ্রাতুষ্কন্যা। গৌরীর একজন ক্ষত্রিয়া ধাত্রী ছিল, তাহাকে সকলেই ক্ষত্রিয়াণী বলিয়া ডাকিত। সে গৌরীকে এত ভালবাসিত—যে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলেই বালিকাকে ক্ষত্রিয়াণীর শিশু বলিত। তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে অন্তিম সময়ের মোহে ক্ষত্রিয়াণী তোমাকে আমার ভ্রাতা জ্ঞানে তোমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিল।"

বলিয়া সস্নেহে হরিদাচার্য্য সুহারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দৃষ্টিতে জুমিয়ার প্রাণে যেন অনল বর্ষিত হইল। তাঁহার ন্যায্য অধিকার হরিদাচার্য্য যেন সবলে গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন! জুমিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ

নিক্ষেপ করিয়া সুহারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাচার্য্য তাহার ক্রোধ লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন—

"যখন বালিকাকে পাইয়াছিলে তাহার হাতে কোন অলঙ্কার ছিল?"

জুমিয়া কোন উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার স্ত্রী সুহারের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল "হুঁ। হাতে যখন কয়া হইলু তহন মুই খুলি রাখুল"

হরিদাচার্য্য বলিলেন—"বংসে তাহা লইয়া এস দেখি। যুধাদিত্য কন্যার শুভ্র হস্তে দুই গাছি নীলা কঙ্কন পরাইয়া দিয়াছিলেন।"

জুমিয়ার স্ত্রী অল্পক্ষণের মধ্যেই কঙ্কণ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হরিদাচার্য্য তাহা হাতে লইয়া বলিলেন—"ইহা সেই কঙ্কন। এখনো কি কাহারো সন্দেহ আছে সুহার আমার ভ্রাতৃকন্যা নহে?"

এতক্ষণে রাজার কথা ফুটিল, রাজা রোষকম্পিত-স্বরে বলিলেন—"এ সমস্তই ষড়যন্ত্র। সুহার আমার বাকদত্তা, সুহার আমার ধর্ম্মপত্নী, সুহার আর কাহারো নহে।

পুরোহিত বলিলেন—"যে বাক্য দিয়াছে সে ভ্রম ক্রমে দিয়াছে। সুহার ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া ক্ষত্রিয়কে—"

জুমিয়া বলিল—"তুইডা কে? তুইডা চুপ কর্, সুহার মুইডার মেয়ে—মুই বিয়া দিবু—"

হরিদাচার্য্য বলিলেন—"কিন্তু শোন জুমিয়া, তুমি দিলেও এ বিবাহ ধর্ম্ম বিবাহ হইবে না, সুহার মহারাজের ধর্ম্মপত্নী হইবে না। তুমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস, আপন হইতে যাহাকে আপনাব ভাব তোমার সন্তান প্রতিম সেই রত্ন—"

জুমিয়া বলিল—"বুঝিনু—বুঝিনু—আর বলুতে হউবে না, মুইডা দিবু না—এ বিয়া দিবু না। মোর মেয়েডা—কুল কনিয়া.—এ বিয়া ধর্ম্ম বিয়া না হউলে রাজাডা মোর মেয়েরে ছুঁইতে নারুবে—" জুমিয়া রাণীর হস্ত হইতে সুহারের হস্ত সবলে বিছিন্ন করিয়া সহস্তে ধরিয়া রাখিল। রাজা ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন—"জুমিয়া সাবধান! এ খেলার স্থল নহে।"

জুমিয়া বলিল—"হুঁই মহারাজ—এ খেলাডা নয়"—

বলিয়া কন্যার হস্ত বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। রাজা জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে তাহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন—"আর এক পদ অগ্রসর হইবে ত এই তরবারি সমূলে তোমার বক্ষে নিহিত হইবে।"

বলিতে বলিতে রাজা কটিস্থ তরবারি উন্মোচন করিলেন। ক্রোধোন্মত্ত জুমিয়া তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ঘৃণার স্বরে বলিল—"মহারাজ সরিয়া যা—তোর তরবারিরে মুই ডরি না"

বলিয়া সে সুহারের হাত ছাড়িয়া কটীস্থ বর্ষা খুলিয়া

ধরিল। সুহার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িতে না পড়িতে জুমিয়ার স্ত্রী তাহাকে কোলে তুলিয়া কুটীরামুখী হইল। বিপদ দেখিয়া হরিদাচার্য্য 'ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও' করিয়া রাজা ও জুমিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় দুর্ব্বল জন্তু—কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জুমিয়া তুইডার 'কিরে' ভুলুলি? রক্ত, রক্ত, জুমিয়া, রক্ত!

জুমিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল—মহারাজ সরিয়া যা—এই বর্ষা এহনি বুকে পড়্‌ল!"

মহারাজ সচকিতে বিবাহক্ষেত্রে সমবেত অল্পসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যদিগকে নিকট অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত আদেশ করিয়া অসি ধরিয়া বলিলেন—"জুমিয়া সরিয়া যাও নহিলে এই তরবারি তোমাকে তফাৎ করিয়া দিবে।" আবার চীৎকার রব উঠিল "রক্ত জুমিয়া রক্ত" জুমিয়ার বর্ষা সহসা উন্নত হইল,—মহিষী এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাড়াইয়াছিলেন সহসা করুণ চীৎকার করিয়া উঠিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। জুমিয়ার আর তখন হস্ত সম্বরণের ক্ষমতা নাই—রাজার তরবারি চালিত হইতে না হইতে বর্ষা সজোরে রাণীর হৃদয় ভেদ করিয়া মহারাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—উভয়ে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন।

আবার চীৎকার রব উঠিল—"রক্ত, রক্ত।"

দলে দলে ভীলগণ খড়্গা, ধনুর্ব্বাণ, যষ্টি হস্তে রাজসৈন্যদিগকে

আক্রমণ করিল—তাহাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল—তাহারা কোথায় পলাইবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না—সমস্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল,—বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

জুমিয়ার বর্ষাঘাতে রাজা রাণী দুইজনে যখন ভূমিশায়ী হইলেন—তখন বজ্রাঘাত পাইয়া সহসা যেন জুমিয়ার জ্ঞান লাভ হইল। নিজের নৃশংস নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র অনল যন্ত্রণা অনুভব করিতেই যেন সে জ্ঞান-লাভ করিল। সেই কল্পনাঅগোচর, অসীম যন্ত্রণাজনক ভয়ঙ্কর দৃশ্য সম্মুখে করিয়া মুহূর্ত্ত সে নিস্পন্দ স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইল—তাহার পর বিদ্যুৎবেগে রাজার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার বক্ষনিহিত বর্ষা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে হস্তের উপর উঠাইয়া লইল। তাহার ব্যবহারে স্তম্ভিত হরিদা-চার্য্যও লব্ধসংজ্ঞা হইয়া রাণীকে তুলিয়া লইয়া জুমিয়াকে বলিলেন—“আমার সঙ্গে এস।” জুমিয়া নিরুত্তরে রাজাকে বক্ষে করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

চারিদিকে আক্রমণ, চীৎকার, যুদ্ধ, রক্তপাত,—তাঁহারা দুইজনে বহু সাবধানে বিদ্রোহোন্মত্ত ভীলগণের পাশ কা-টাইয়া নিভৃত নদীতীরে আসিয়া, স্রোতস্বিনীর অতি

নিকটে এক পাহাড়ের পাদদেশে শ্যামল শষ্পশয্যার উপর দুইটি দেহভার নামাইলেন। রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল, রাজার বক্ষ তখনো যেন ঈষৎ কাঁপিতেছিল, হরিদাচার্য্য তাঁহার অঙ্গাবরণ খুলিতে লাগিলেন, জুমিয়া নদীতে বস্ত্র ভিজাইয়া আনিয়া তাঁহার আহত বক্ষে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল।

তখন পরিপূর্ণ প্রভাত, পাহাড়তল ছায়াময়, কিন্তু নদীবক্ষে সূর্য্য কিরণ ঝলমল করিতেছে, তাহার প্রতি-ফলিত উজ্জ্বলতা বিকম্পিত হইয়া রাজার বিবর্ণ মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। রাজাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে বিদীর্ণ-প্রাণ-জুমিয়া সেই মুখের দিকে চাহিতেছে। রাজার অর্দ্ধ-মুদ্রিত নয়ন সহসা একবার উন্মুক্ত হইয়া দুইটি মুমূর্ষু নয়নের বিহ্বল-কটাক্ষ জুমিয়ার সেই কাতর দৃষ্টির উপর স্থাপিত হইল, জুমিয়া আর পারিল না—উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "মহারাজ মোর আপন হাতে তুইডারে খুন করিনু—" রাজা স্খলিত বচনে ধীরে ধীরে বলিলেন—

জুমিয়া আমি—দোষী, তুমি না—আমাকে ক্ষমা কর।" জুমিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল কাঁদিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল—"মুইডা ক্ষমা করিবু কারে? মোর ক্ষমা লইবু কে? তুইডারে না, মুইডারেই মুই ক্ষমা করুব—যে বর্ষা তোরে বিঁধুল সেই বর্ষা মুইরেই ক্ষমা করুবে" রাজা মুমূর্ষুর সম্পূর্ণ বল আয়ত্ত করিয়া কহিলেন—"আমার অনুরোধ,

তুমি মরিও না। আমার শিশু সন্তান রহিল—তাহাকে রক্ষা কর—রাজ পরিবারগণ রহিল—তাহাদের—” রাজা আর পারিলেন না, তিনি নির্বাক হইয়া পড়িলেন—প্রাণ বায়ু তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ... .

রাজার মৃত্যুকালীন আদেশ জুমিয়াকে বজ্রবল প্রদান করিল। রাজার মৃত্যুর পর সে অশ্রুহীননেত্রে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিদাচার্য্য বলিলেন “কোথা যাও?” সে বলিল—“রাজপুত্ররে বাঁচাইতে।”

হরিদাচার্য্য বলিলেন “তুমি রাজ অন্তঃপুরে সহজে প্রবেশ পাইবে না, ইঁহাদের সৎকারের জন্য মন্দির হইতে লোক পাঠাইয়া অগ্রে আমি রাজবাটিতে গমন করি—ততক্ষণ তুমি শব রক্ষা কর। তাহারা আসিলে—তাহাদের হস্তে সৎকার ভার দিয়া তুমি আমার সহায়তায় আসিও!”

হরিদাচার্য্য চলিয়া গেলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দির-ভৃত্যগণ কাষ্ঠ প্রভৃতি সৎকার দ্রব্যাদি আনয়ন করিল, অল্প-ক্ষণের মধ্যেই চিতা প্রস্তুত হইল, রাজারাণী একত্রে তাহার উপর শায়িত হইলেন, চিতায় অগ্নি অর্পিত হইল, ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, জুমিয়া তখন শেষবার সেই জ্বলন্ত চিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে রাজ-বাটীর অভিমুখী হইল।

ইত্যবসরে হরিদাচার্য্য শিশুকে লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, রাজোদ্যান ভীলে সমাকীর্ণ। তিনি ফিরিয়া

অন্তঃপুরের এক ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া মন্দিরের নদীতীরে আসিয়া পড়িলেন, সেইখানে জুমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরিদাচার্য্য বলিলেন—"আমি শিশুকে আনিয়াছি। তুমি শীঘ্র যাও গিয়া রাজ পরিবারদিগকে রক্ষা কর"—

জুমিয়া বলিল—"মুইডা চলিনু। যদি না ফিরি—সুহারডা তোর।"

হরিদাচার্য্য চলিয়া গেলেন, জুমিয়া দ্রুতগতিতে রাজ বাটীর দ্বারে আসিয়া শত সহস্র ভীলের তরঙ্গ একাকী রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জুমিয়াকে রাজপরিবারের পক্ষ দেখিয়া অনেক ভীল তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল, অনেকে তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠিল—তাহাদের মধ্যে ক্ষণিক আত্মসংগ্রাম আরম্ভ হইল, এই সুযোগে ক্ষত্রিয় সেনাদল অনেকে দলবদ্ধ হইয়া স্ত্রীকন্যাদিগকে সরাইতে লাগিল অনেকে ভীলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই আত্মরক্ষা-পরায়ণ ক্ষত্রিয়দিগকে সাহায্য করিতে করিতে বাণাহত হইয়া জুমিয়া ধরাশায়ী হইল।

উপসংহার।

বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, ভীলেরা জয়ী। ইদর হইতে ক্ষত্রিয়গণ পলাইয়াছে—ভীলের রাজ্য ভীল পুনরায় পাইয়াছে, মহা-উৎসবের মধ্যে জুমিয়ার ভ্রাতা রাজসিংহাসনে বসিয়াছে।

কিন্তু এখন সুহার কোথায়?

অপরিচিত দূর রাজ্যে, নির্জ্জন বন প্রদেশে, একটি ভগ্ন মন্দির প্রাঙ্গনে এক ঘুমন্ত শিশুকে কোলে করিয়া একজন যুবতী বসিয়াছিল। অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ প্রাঙ্গনস্থিত অশ্বত্থের নিবিড় পত্রশাখা ভেদ করিয়া যুবতীর বিষণ্ণ মুখও উজ্জ্বল করিয়াছিল। বিহঙ্গের কোলাহল ধ্বনিত অরণ্যের মস্তকের উপর—অল্প বিস্তৃত মুক্ত আকাশ তলে মেঘের বিচিত্র স্তর ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছিল। যুবতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া কোন দূর স্বপ্ন রাজ্যে, স্মৃতি রাজ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ক্রোড়ের শিশু ঘুমঘোরে চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিল—যুবতী অমনি নতদৃষ্টি হইয়া—তাহাকে চুম্বন করিল, মুক্তার ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রুতে বালকের কপোল অভিষিক্ত হইল। সেই চুম্বনে বালক মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া হাসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। যুবতীর মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দ বিভাসিত হইল। এই যুবতী যে সুহার আর শিশু যে নিবাব

সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিপতি বাপ্পা, তাহা সম্ভবতঃ পাঠককে বলিবার আবশ্যক নাই।

এই বালকই এখন সুহারের প্রেম বন্ধন, তাহার স্মৃতির আনন্দ, তাহার রক্ষাতেই তাহার পালনেই সুহার আপন জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছে।

এইখানেই প্রেমের নিঃস্বার্থতা ; প্রেমের আদর্শ ভাব। এইরূপ জীবন দানেই প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন, আত্মহত্যায় নহে। যে প্রেমে দুঃখে সহিষ্ণু করিয়া মঙ্গল কার্য্যে রত করে, সেই প্রেমই মহৎপ্রেম, তাহাতেই প্রেমের প্রকৃত বল। এই মঙ্গলময় আত্মবিসর্জন প্রথমে দুঃখের হইলেও পরে প্রকৃত সুখের। তবে ইহা মহতের ধন, ক্ষুদ্রের উপভোগ্য নহে !

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের গায়ে গায়ে দুএকটি তারা জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল—গাছের শাখায় শাখায় পাতার গায়ে গায়ে দুয়েকটি খদ্যোৎ জ্বলিয়া উঠিল, যুবতী উঠিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক শিশুকে শয্যাশায়িত করিয়া গৃহে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিল। এই সময় একজন পুরুষ ফল মূল ও দুগ্ধ পাত্র হস্তে গৃহপ্রবেশ করিল। এ ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ক্ষেতিয়া। এই অসভ্য নিঃস্বার্থ-প্রেমের আর একটি দৃষ্টান্ত। সুহার রাজার প্রেম-স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহার বালকের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছে,—

ক্ষেতিয়া সুহারকে ভালবাসিয়া তাহার দাসত্বে তাহার ভক্তি-পূজায় জীবন সমর্পণ করিয়াছে। সুহার বালকের মাতৃ-প্রেমে রাজার প্রেম প্রতিদান পাইয়াছে, তাই তাহাকে মন প্রাণ দিয়া তাহার পূর্ণানন্দ, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্ষেতিয়া সুহা-রের তাচ্ছিল্য উপহার পাইয়াও তাহার দাসত্বে সুখী। কাহার প্রেম আদর্শতর—মহত্তর ?

হবিদাচার্য্য এখন এই মন্দিরের অদূরবর্ত্তী স্থানে যোগ-নিমগ্ন। যাহার জন্য তিনি যোগ বিরত হইয়াছিলেন, সে আর নাই, সুতরাং তাঁহার আজীবনবাঞ্ছিত এই উদ্দেশ্য সাধনে এখন আর কে বাধা দিবে ?

বাপ্পা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহাঁরই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল, এবং ইহাঁরই প্রসাদে নানা বিপদোত্তীর্ণ হইয়া মিবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইতি সমাপ্ত।